# বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী
সম্পাদিত

DONATED BY
DR. MAHMUD SHAH
QURESHI & FAMILY

# বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী
সম্পাদিত

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আই.বি.এস. সেমিনার ভলিউম : ৯

প্রকাশক ঃ মোফাজ্জল হোসেন
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ১৯৯৭

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ ডঃ আবু তাহের বাবু

মুদ্রণে ঃ উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
গ্রেটার রোড, রাজশাহী-৬০০০

মূল্য ঃ টাকা ১৫০.০০
US $ 10.00

# নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা সম্পর্কে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হলো। একই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বাংলা শিরনামেও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিলো আমাদের ইনস্টিটিউটে। তাই, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে বিশ শতকে কবিতার ইতিহাস রচনার সমস্যা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অধ্যক্ষ মিন্নাত আলী স্বয়ং কথাশিল্পী বলে এ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান এবং ৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে সব সম্প্রদায়ের অবদানে সমৃদ্ধ কথা সাহিত্যের ভুবনের একটি চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন। *আই.বি.এস জার্নাল : ৪*-এ অন্য সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলো সংকলিত হলেও তাঁর প্রবন্ধটি আমরা এখানেই প্রকাশ করছি– ভবিষ্যতের ইতিহাসকারের সুবিধার্থে।

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান প্রথমাবধি এ ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং মূল প্রবন্ধ রচনা করে আমাদের কাজ সহজ করে দিয়েছেন। জুন, ১৯৯৬-তে প্রবহমান রাজনৈতিক গরম হাওয়ার কারণে আমন্ত্রিত পণ্ডিতদের অনেকে রাজশাহী আগমনে অপারগ হয়েছেন। তবু, বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন মহাপরিচালক মনসুর মুসা, সাবেক মহাপরিচালক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও অন্যান্য সুধীমণ্ডলী এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ড: অনিমেষ পাল অল্প পরে প্রবন্ধ প্রেরণ করেছিলেন। ড: ভূদেব চৌধুরী ও ড: সুভদ্র সেন একটি ভিন্ন প্রকাশনা, ড: সরদার আব্দুস সাত্তার ও ড: মুহিবুল্লাহ সিদ্দিকী সম্পাদিত *মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী সংবর্ধনা গ্রন্থের* জন্য, আরো কিছু পরে পাঠিয়েছিলেন তাদের প্রবন্ধ দু'টি। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতার বিবেচনায়, সম্পাদকদ্বয়ের অনুমতিক্রমে, আমরা সে দু'টি এখানে প্রথম প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করি। একই কারণে ড: মুহম্মদ আবদুল খালেকের পূর্ব- প্রকাশিত প্রবন্ধটিও এ গ্রন্থে সংকলিত হলো। তাছাড়া নিবেদকের স্বাগত ভাষণটিও ঈষৎ কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ প্রস্তাবিত হলো। সঙ্গে সংযোজিত হলো একটি বড় আকারের কিন্তু ঈষৎ অসম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী।

আশা করি, আমাদের এই প্রয়াস ভবিষ্যতের গবেষকদের কাজে আসবে, তাঁদের চিন্তার পরিধি নির্মাণে সহায়ক হবে। এই গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এ আমার দু'দশকের কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটছে, সেটিও আনন্দময় অভিজ্ঞতার এক ছোট্ট ইতিহাস! সর্বপ্রকারের সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ রইলাম।

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪

# সূচীপত্র

DONATED BY
DR. MAHMUD SHAH
QURESHI & FAMILY


| | | |
|---|---|---|
| মাহমুদ শাহ্ কোরেশী | বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা | ১ |
| সৈয়দ আলী আহসান | বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা | ১৪ |
| মনসুর মুসা | বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা | ২৭ |
| মুস্তাফা নূরউল ইসলাম | বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় সমস্যা | ৩৬ |
| মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল | প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা | ৪৫ |
| মুহম্মদ আবদুল খালেক | বাঙলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ ও তার নবমূল্যায়ন | ৫২ |
| মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান | বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার ইতিহাস রচনার প্রাসঙ্গিক সমস্যা ও প্রত্যাশা | ৮১ |
| মিন্নাত আলী | বিশ শতকের কথা সাহিত্যের কথা | ৮৬ |
| অনিমেষ কান্তি পাল | বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা | ৯৫ |
| ভূদেব চৌধুরী | বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ভাবনা ও প্রযোজনা | ১০৬ |
| শ্রী সুভদ্র কুমার সেন | বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা | ১১৫ |
| প্রীতি কুমার মিত্র | ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস | ১২২ |

# বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মাহ্‌মুদ শাহ্ কোরেশী

.....the literary is ineluctably a historical fact...its historicity is a fact in our aesthetic experience.

*Lionel Trilling*

অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজস্থিত মানুষের বিজ্ঞানরূপে ইতিহাস অধুনা মানববিদ্যা ও সামাজিক বিজ্ঞানের পুরোভাগে দেদীপ্যমান। রাজারাজড়া, সেনাপতি, বিচারক, ধর্মযাজক, প্রশাসক, সওদাগর, শিল্পপতি প্রভৃতি যেমন তাতে পেয়েছে নির্ধারিত স্থান তেমনি সাধারণ মানুষ তাদের বহুবিচিত্র জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকছে উপস্থিত। বিস্ময়কর এই সম্মিলনী জাতি গঠনের উপাদান এনে দেয়, প্রতিভার জন্ম দেয়, প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ বাধায়, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস পরিণত হয় আন্দোলনে।

বহুকাল অবধি আমরা পেয়েছি রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগমনের কাহিনী, একটি জাতির সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ধারাকে যে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করতে হবে ইতিহাসের এই বোধ এলো অনেক পরে। সর্বোপরি সে জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনের সংগ্রামই যে অনুধাবনযোগ্য হতে পারে বিংশ শতাব্দীর অন্তিম-পর্বের ইতিহাসবিদদের এ আরেক নতুন উপলব্ধি।

অতএব, ইতিহাসচিন্তায় অখণ্ড ভাবরূপ বিদ্যমান থাকলেও অধুনা এটি আর একক ও অবিভাজ্য সত্তার মননক্রিয়া নয়। এর বহু রকমভেদ আছে। এককালে আমরা শুধু 'রাজনৈতিক ইতিহাস'কে ইতিহাস বলে জানতাম ও মান্য করতাম। সঙ্গে অল্পবিস্তর অন্য বিষয়। উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকে 'সামাজিক ইতিহাসে'র জোয়ার বইলো। এই সুবাদে জন্ম নিলো বহু রকমের ধারণা ও মতের। এলো 'সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস'- একক অথবা দ্বৈত সত্তায়। ঐতিহ্যসূত্রে লব্ধ মানুষের গভীরতর, সুন্দরতর, বেদনামধুর চিন্তাভাবনার যে লিখিত-অলিখিত রূপ—তাই তো 'সাহিত্য'। এই সূত্রে সমাজ ও ব্যক্তি মানসের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক অংশ নিয়েই 'সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে'র সাম্রাজ্য। সামাজিক-বিজ্ঞান প্রসূত বহু ধ্যানধারণা আক্রান্ত ইতিহাসের এই

ধারায় 'সাংস্কৃতিক ইতিহাস' বেশী পরিমাণে নৃতত্ত্ব, এবং 'বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস' সেরকম সমাজতত্ত্ব ও দর্শন প্রভাবিত। সর্বতোভাবে 'মানবতাবাদী' দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়—বিচারের সমস্যাটিও উত্থাপিত হয় এ প্রসঙ্গে। সেদিক থেকে আমরা দেখি, 'চৈতন্য' ও 'সংবেদনশীলতা'র ভূমিকা-যেমন ব্যক্তিমানসে, তেমনি সমাজ অবয়বে।

সাহিত্যের ইতিহাস শুধু যে একটি ভাষাগোষ্ঠীর আদ্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টির তালিকা ও অন্যান্য বস্তুগত উপাত্ত উপস্থাপন করবে তা নয় বরং এতে আমরা দেখতে পাই যে সামগ্রিকভাবে জাতীয় চৈতন্য কীভাবে ভাষাকে অবলম্বন করে বিকশিত হচ্ছে তারই ধারাবাহিকতাকে। সে কারণে অংশত দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিবরণও থাকবে এতে। কাল নিরবধি মানবিক মূল্যবোধের পরিচয়- চিহ্নিত অথচ একটি দেশের অন্তরাত্মার প্রতিচ্ছবি সহজলভ্য এমন রচনা সাহিত্যের ইতিহাসকারের অন্বিষ্ট। কিন্তু কালানুক্রমিক কিংবা যুগান্তকারী অথবা অঞ্চলবিশেষকে কেন্দ্র করে রচিত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আপাত- অপ্রয়োজনীয় এবং অনুলেখ্য সাহিত্যকর্মও আলোচিত হতে পারে এতে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যাবলী নিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করবো এবার:

ক. যে ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি সেই বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিষয়টি এখনও খুব স্পষ্ট হয়েছে কি? এ সম্পর্কে কেউ ড: সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, কেউ ড: শহীদুল্লাহ প্রদত্ত যুক্তিতথ্য তুলে ধরেন, সমন্বয় সাধনের কিংবা পুনর্নুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন তথ্যলাভের প্রয়াস নেই। তাই প্রশ্ন জাগে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার না দেড় হাজার বছরের পুরনো?

খ. গোড়া থেকেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের রয়েছে উপাদানগত সমস্যা। ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান সঙ্গতই বলেছিলেন, 'উপাদানের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ অজ্ঞাত, মধ্যযুগ অবজ্ঞাত এবং আধুনিক যুগ অবহেলিত।'[১]

গ. প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার এখন হয়তো আর সম্ভব হবে না কিন্তু দেশে-বিদেশে তথ্যানুসন্ধানের ব্যাপক প্রয়াস ও সেগুলোর সুষম বিন্যাস বিশেষভাবে প্রয়োজন। বহু পাণ্ডুলিপি কলকাতা, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও অন্যত্র গ্রন্থাগারে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে আত্মগোপন করে আছে। উপযুক্ত গবেষক, পণ্ডিত, প্রকাশক যে সেগুলোর পাঠনির্ণয়, সম্পাদনা ও মুদ্রণে আগ্রহী হবেন ইদানিংকালে তা খুব কম দেখা যাচ্ছে।

ঘ. যুগ বিশেষের বা অঞ্চল বিশেষের উপকরণসল্পতা ব্যাপক অনুসন্ধানের দ্বারা পূরণ করবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থাগ্রহণের সমস্যা।



ঙ. বাংলার সঙ্গে অতীতে সংশ্লিষ্ট পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আসাম, বিহার, ওড়িশার ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারও সাহিত্যকর্মীর কাছ থেকে প্রত্যাশীত যা ইতিহাসকার স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

চ. মধ্যযুগের কাব্যের শিল্পগত তাৎপর্যনির্ধারণ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে প্রচারগত দিকের বিশ্লেষণ সমস্যাসংকুল হয়ে আছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ পরিহারের উপায় নির্ধারণও জরুরী হয়ে রয়েছে।

ছ. দুশো বছরের 'আধুনিক' কালের উপাদানের উপযুক্ত সংগ্রহ, শ্রেণীবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

জ. ঔপনিবেশিক আমলে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের বিভিন্ন স্তর নির্ণয় ও ব্যাখ্যা; উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিবেশের সঙ্গে তুলনা।

ঝ. বাংলা সাহিত্যের পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার সঙ্গে সাতচল্লিশ পরবর্তী ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয়।

ঞ. সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যের অগ্রগতি ও বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাবের স্বরূপ সম্পর্কে বিশদ বিবেচনা ঃ ভাবীকালের পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ক গবেষণা।

আরো বহু সমস্যা আছে সাহিত্যের ইতিহাসকার তাঁর প্রস্তুতিপর্বে পাঠ, বোধ, ভাবনা, প্রজ্ঞা ও জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খুঁজে বের করবেন এবং স্বয়ংসিদ্ধ পদ্ধতিতেই সমাধানের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। অবশেষে আমরা প্রয়োজনসিদ্ধির উপযুক্ত এক-একটি গ্রন্থ পাবো বা গ্রন্থের পশ্চাতে এক-একটি ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত ঘটবে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্ভাবনার অবারিত দ্বার উন্মোচন করবে।

ফ্রান্স তথা ইউরোপের সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে উনিশ শতকীয় 'পজিটিভিষ্ট' ধ্যানধারণায় গুস্তাভ লঁসোঁ যার প্রবক্তা।[২] এ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে 'স্ট্রাকচারালিষ্ট' তথা অবয়ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। এ ধারার পণ্ডিত রোলঁ বার্থ উদাহরণ টেনে বলেন, সঙ্গীত যেমন শুধু অর্কেষ্ট্রায় কিংবা শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রবণেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত নয়—এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কেই এর অবস্থান। সমালোচকের কাজও সেরূপ। তথাকথিত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা নয় বরং তাঁর নিজস্ব প্রতীকবৃত্তের উন্নয়ন সাধনই মূলের প্রতীক-জগতের সঙ্গে সংগীতাখ্য সুষম সম্পর্কে অন্বিত। সমালোচক বিষয়ের বিচারক নন, তিনি প্রতীক-জগতসমূহের পারম্পর্য পরীক্ষা করেন কেবল। বার্থের মতে,

সাহিত্যের ইতিহাস সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে একই সূত্রে বিবেচিত হতে পারে মানুষের লেখক-মানসিকতার ইতিহাসরূপে। একেই তিনি বলেছেন 'হিস্টরি অব রাইটিং'।[৩]

সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিটি 'যুগে', প্রতিটি 'পর্বে', প্রতি লেখকের রচনার মূল বক্তব্য বা মূল সুর এবং সমকালের সঙ্গে তার সম্পর্ক আমাদের অন্বেষণের বিষয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে একজন পূর্বসুরীর একটি বক্তব্য এখানে প্রাণিধানযোগ্যঃ

> 'সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। সর্ব্বপ্রথম দেখা কর্ত্তব্য কোন এক বিশেষ কালের সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মূল কথাটি কি। ইহা ধরিতে না পারিলে সাহিত্যের ইতিহাস প্রাণহীন হইবে। ইহা শুধু কতকগুলি সন-তারিখ ও ঘটনা বর্ণনায় পর্যবসিত হইবে। নানারূপ তথ্য ও বিবরণ দ্বারা এক শ্রেণীর বা সময়ের সাহিত্য পরিবেষ্টিত থাকিলেও ইহার প্রাণ-শক্তির উৎসই মূল কথা। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল কথা বা মূল সুরটি কি? আমাদের মনে হয় ইহা একটি শান্ত ও সমাহিত ধর্ম-ভাব। প্রাচীনকালে এতদ্দেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের বাহিরে একটি বৃত্তের জগৎ ও উৎকৃষ্টতর জীবন কল্পনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহাদের মতে এই জগৎই সর্ব বিষয়ের শেষ নহে। তাঁহাদের এই আদর্শের প্রভাব প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সুস্পষ্ট।'[৪]

প্রাচীন 'যুগ' থেকে কবে মধ্যযুগে উর্ত্তীণ হলো কী সব পরিবর্তিত সুর ও ভাবধারা নিয়ে? আধুনিকতা ও প্রলম্বিত সামাজিকতার কাল বিভাজনের সূত্র কী হবে? মানবধর্ম, মানবিকতা, শ্রেণী-চেতনা, ইহজাগতিকতা ইত্যাদি ভাবধারার উদ্ভব ও বিকাশের সূত্র কি জরুরী নয়?

এই তো সেদিন আমরা বাংলা নতুন শতাব্দে অবতীর্ণ হলাম। অল্প কিছু কালের মধ্যে প্রত্যক্ষ করবো একবিংশ শতাব্দী তথা খ্রীস্টিয় তৃতীয় সহসাব্দ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে দুহাজার বছরের মধ্যে আমরা যা অর্জন করেছি তারই যেন পরিপূর্ণ সংশ্লেষণ হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। কেননা বহির্বিশ্বের চাপে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে বিশ শতকের বাংলায় ঘটেছে বহু রকমের পরিবর্তন। আমাদের সাহিত্যে রয়েছে তার শৈল্পিক প্রতিফলন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক রীতিনীতি ও শৈল্পিক সৌকর্য কতটুকু অনুসৃত হয়েছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বিতর্কিত হলেও সাহিত্যের 'থিয়োরী' বলে একটা বিষয় আছে, আছে সমালোচনার বহুকর্ষিত ভুবন। এখন আমরা এর সঙ্গে সম্পর্কিত করছি ইতিহাস-কে। কিন্তু এগুলোকে আলাদা রেখে সাহিত্যের ইতিহাসকার কিংবা সমালোচক এগোতে পারেন না। বহু আগে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রনে ওয়েল্লেক লিখে গেছেন যে,



> '.....They implicate each other so throughly as to make inconceivable literary theory without criticism or history, or criticism without theory and history, or history without theory and criticism'.[৫]

পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় হাজারখানেক ভাষার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার ভাগে রয়েছে অন্তত দেড়শোটি। বিশ্বজরীপে শ-খানেক আর উপমহাদেশে পনেরো-বিশটির মতো ভাষায় পাই সমৃদ্ধ সাহিত্য। ইউনেস্কো এক সময়ে ইংরেজি ও ফরাশিতে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রকাশিত হয়েছে হাতে-গোনা কয়েকটি। বর্তমান নিবন্ধকারের অনুরোধে সে সময়কার সাহিত্য-বিভাগ পরিচালক রজে কাইওয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশে সম্মত ছিলেন। কিন্তু, নানা কারণে তা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয়নি। এই ভূখণ্ডে বাংলা ও তামিলনাড়ুর সাহিত্য সহস্রাব্দের অধিক প্রাচীন। বাংলার ঐতিহ্য বিশ্ববিশ্রুত। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ফরাশি ইতিহাসগ্রন্থে লিখিত হয়েছেঃ Le Bengale, region de grande creativite hindoue comme musulmane, a particulierement fascine les specialistes. [ হিন্দুর মতো মুসলমানেরও বিপুল সৃজনশীলতার এলাকা বঙ্গদেশ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে বিশেষজ্ঞদের। ][৬]

আবহমান কালের বাংলার ঐতিহ্যে আগামী দিনের বাংলাভাষীও তাঁদের সৃজনশীল তৎপরতার পরিচয় তুলে ধরবেন বিমুগ্ধ বিশ্ববাসীর কাছে— এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম সাহিত্য সৃষ্টিতে, সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে অধিকতর অগ্রণী ভূমিকা নেবেন, এটাইতো প্রত্যাশীত।

## তথ্য নির্দেশ


১. কাজী আবদুল মান্নান, "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান", মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত *সাহিত্যিকী* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) শরৎ সংখ্যা, ১৩৭৫, পৃ. ২৩।

২. Gustave Lanson, *Essais de methode, de critiques et d' histoire litteraire.* Rassembles et presentes par Henri Peyre; 477 pp. Paris : Hachette.

৩. Roland Barthes: *Elements of Semiology, Writing Degree Zero.* Paris/London, 1966.

P.Van Tieghem, *Histoire litteraire de l'Europe et de l'Amerique: de la Renaissance a nos jours;* Paris, 1951.

D. Pace, "Structuralism in History and the Social Sciences", *American Quarterly*, Bibliography Issue, 1978, pp. 282-297.

৪. ডক্টর তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১, ভূমিকা, পৃ. ২৫-২৬।

৫. Rene Wellek & Austin Warren, *Theory of Literature;* New York: Harcourt Brace; 1949; pp. 30-31.

৬. *HISTOIRE De L'INDE MODERNE : 1480-1950;* sous la direction de Claude Markovits; Paris: Fayard; 1994; pp. 204-205.

## গ্রন্থপঞ্জী

[ একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জীর প্রাথমিক প্রয়াস বর্তমান তালিকা। বলাবাহুল্য, এটি অসম্পূর্ণ এবং অংশবিশেষে ত্রুটিযুক্ত ]।


অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, কলকাতা, ৪র্থ সং ১৯৬১।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *উনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-চর্চা;* কলকাতাঃ ১৯৮০।

অনিরুদ্ধ রায়, "মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যঃ পর্যালোচনা" *ইতিহাস*, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা; কলকাতা, ১৯৭২ পৃ: ৪৭-৫৮।

অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ;* কলকাতা, ১৯৫২।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুতুল; কালের প্রতিমা; উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য...*

অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৬ খণ্ডে, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস*।

আহছান উল্লাহ (খান বাহাদুর), *বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য*, ১৯১৮ (ঢাকা, ১৯৮৩)।

আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ* ঢাকা, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৭৭।

আব্দুল করিম, "মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য", *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বর্ষা ১৩৭২।

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, *বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ*, কলকাতা: ১৯১৩-১৪।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ, *মুসলমান ও বাংলা সাহিত্য*, ১৯২২।





আব্দুল মান্নান সৈয়দ, "বাংলা সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব", *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৬-৬-৯৬।

আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন, *পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস*, ১৯৬৯।

আবুল হাসনাদ, *মুসলিম রচিত উপন্যাস*, ঢাকা: ১৯৭০।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ১৯৬৪ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র;* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭০, *স্বরূপের সন্ধানে;* ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৬ *পুরনো বাংলা গদ্য*, ১৯৮৪ "বাংলাদেশে রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঈদ সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ: ১১০) (সম্পাদিত) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড; ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন*, ঢাকা, ১৩৭৬।

আলী আহম্মদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮০।

আশকার ইবনে শাইখ, *বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে;* ঢাকা, ১৯৯১।

আশরাফ সিদ্দিকী, *লোক সাহিত্য*, ১৯৬৩।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৫০।

আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৭। *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, দুখণ্ডে, ১৯৭৮, ১৯৮৪। *বাঙ্গালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা;* ঢাকাঃ ১৯৮৭।

ঈশ্বর গুপ্ত, *কবিজীবনী*, ভবতোস দত্ত সম্পাদিত; কলকাতা, ১৯৫৮।

উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউলগান;* কলকাতা; দ্বিতীয় সং, ১৩৭৮।

এ. কে. এম আমিনুল ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য;* ঢাকা, ১৯৫৯।

ওয়াকিল আহমদ, *সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা: ফুডেন্টওয়েজ, ১৩৭৪। *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, ১৯৭৪। *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা;* ২ খণ্ডে, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা;* রাজশাহী; ১৯৬১; ২য় সং, ঢাকা, ১৯৬৯। *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজ*, ঢাকা: ১৯৯০।

কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, চারখণ্ডে, ১৯৬৮-৬৯।

কনক বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ*, ১৩৬৮, ১৩৭১ কালিদাস রায়, *প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য*, ১ম ও ২য় খণ্ড; কল্যাণী মল্লিক, *নাথ সম্প্রদায় ও সাহিত্য;*

কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, কলকাতা; বিশ্বভারতী, ১১৪৬। *শাশ্বত বঙ্গ;* কলকাতা; ১৯৫১।

খগেন্দ্র নাথ মিত্র, বৈষ্ণব রস সাহিত্য;

খান সারওয়ার মুরশিদ, (সম্পাদিত) *সমকালীন বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৯।

খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলমান সাহিত্য সমাজ:* চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম; ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৪।

গঙ্গাচরণ সরকার, *বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা*, চিনসুরা, ১৮৮০

গোলাম সাকলায়েম, *বাংলার মর্সীয়া সাহিত্য*, ১৯৬৪।

গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপ রেখা;* ২ খণ্ডে, কলকাতা, ১৯৫৪, ১৯৫৮। *বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি* ১৩৬৩, ১৩৬৯।

চন্দ্র নাথ বসু, *বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি*, ১৩০৬।

তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা;*

তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (ড:), *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস;* কলকাতা, ১৯৫১।

ত্রিপুরা শংকর সেন, *উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, ১৩৬০

দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১৮৯৬ *বৃহৎ বঙ্গ*, ১৯৩৫ *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মুসলমানদের অবদান* ১৯৪০

দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস;* ১৯৫৯

নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা*, ২য় সং, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বলিত, কলকাতা, ওরিয়েন্ট, ১৩৬৫।

নন্দ লাল শর্মা, *পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, রাঙ্গামাটি: ১৯৮১।

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, *বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস;* ৩ খণ্ডে; ঢাকা, ১৯৫০-।

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব;* কলকাতা ১৯৪৯

প্রনব রঞ্জন ঘোষ, *উনবিংশ শতাব্দীর মনন ও সাহিত্য;* কলকাতা, ১৩৭৫।

প্রমথ চৌধুরী, *প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান;* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৬০।

প্রমথ নাথ বিশী, *বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য;* কলকাতা, ১৩৬৭।

বাসন্তী চৌধুরী, *বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য;* কলকাতা, ১৯৬৮।

বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্যৎ সমাজ; কলকাতা*, ১৯৮৭; *সংবাদপত্রে বাঙ্গালীর সমাজচিত্র;* চার খণ্ডে।

*বাংলাদেশের সাহিত্য;* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্য চিন্তা;* প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত।

বিমান বিহারী মজুমদার, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য;*

ব্রজসুন্দর সান্যাল, *মুসলমান বৈষ্ণব কবি;*

বৈদ্যনাথ শীল, *বাংলা সাহিত্য নাটকের ধারা;*

ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম পর্যায়, ১৯৫৪; ২য় পর্যায়, ১৯৮৪; ৩য় পর্যায়, ১৯৮৭। *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।*

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বৈষ্ণব সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব;*

ভোলানাথ ঘোষ, *বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা;*

মুনসুর মুসা, *পূর্ব বাংলার উপন্যাস*, ১৯৭৪।

মনীন্দ্র মোহন বসু, *বাঙ্গালা সাহিত্য; সহজিয়া সাহিত্য;*

মযহারুল ইসলাম, *সাহিত্যের পথে;*

মুহম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে লোকউপাদান* ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক;* পাবনা: ১৯৮৩।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক কাল); ঢাকা*, ১৯৫৬।

মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য; ঢাকা*, ১৯৫৭।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামনি* (বহুখণ্ডে) ১৯৩০-, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা;* তিনখণ্ডে ১৯৬০-৬৬।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ভাষা ও সাহিত্য*, ঢাকা: ১৯৪৮। *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ১৯৫৩, ২ খণ্ডে; ঢাকা, ১৯৬৪। *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত; ঢাকা*, ১৯৫৯।

মুহম্মদ আবু তালিব, *বাংলা সাহিত্যের ধারা;* রাজশাহী, ১৯৬৮।

মুহম্মদ মজিরউদ্দিন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, নওগাঁ: ১৯৭০।

মুহম্মদ মতিউর রহমান, *বাংলা সাহিত্যের ধারা*, ঢাকা, ১৯৯১।

মুহম্মদ মুজিবুর রহমান, *মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা*, রাজশাহী, ১৯৮০।

মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গভাষার ইতিহাস; কলকাতা*, ১৯৭১।

মুনীর চৌধুরী, *বাংলা গদ্যরীতি; তুলনামূলক সাহিত্য; ঢাকা*, ১৯৭০।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*; ২সং ঢাকা: ১৯৬৯। *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী: ১৯৭৭।

মুহম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, ঢাকা, ১৯৭৮।

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, *বাংলা ভাষার ইতিহাস*, রাজশাহী, ১৯৮৫।

মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, *বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তকের তালিকা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৭৭।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য;* ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৬৫, ১৯৬৯। *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫৭-১৯২০)* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭০।

মোহিত লাল মজুমদার, *সাহিত্য-কথা।*

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচায, *বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি;* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৬২।

যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, *বঙ্গীয় দূতকাব্যেতিহাস;।*

রণজিৎ কুমার সেন, *বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য;* ১৩৬৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাচীন সাহিত্য, লোক সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা", সাহিত্যের স্বরূপ।*

রশীদ আল ফারুকী, *বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান:* ১৯৮৫-১৯৩০; কলকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৮৪।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ*, ১২৫৯।

রাজ নারায়ণ বসু, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা*, ১৮৭৮।

রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, চুঁচুড়া*, ১৮৭৩।

শশাঙ্ক মোহন সেন, *বঙ্গবানী;* ঢাকা, ১৯১৫, *বানী-মন্দির*, ১৯২৮।

শশীভূষণ দাশগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ; কলকাতা;*

শংকরী প্রসাদ বসু, *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য;* কলকাতা, ১৩৭১।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু, *বাংলা সাহিত্যের নানারূপ*, কলকাতা, ১৩৮৬।

শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্য উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৩৮৯। *বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা* কলকাতা, ১৯৫৯।

সজনীকান্ত দাস, *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা*, ১৩৪৬।

সতী ঘোষ ও প্রভা রায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত;* কলকাতাঃ ১৯৮০।

সরদার আব্দুস সাত্তার, *কথাসাহিত্যের কথকতা;* ঢাকা: ১৯৯৭।

সরদার ফজলুল করিম, *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য;* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮।

সবিতা দাস (চট্টোপাধ্যায়), *বাঙ্গালা সাহিত্য ইউরোপীয় লেখক; কলকাতা*, ১৯৭২।



সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, চারখণ্ডে ১৩৫৫-*ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা ১৯৫১।

সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম;* কলকাতা, ১৯৭৪। *বাংলার নাথ সাহিত্য;*

সুলতান আহমদ ভূইয়া, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, ১৯৭১।

সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কাব্য;*

সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (আধুনিককাল)*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: আদিপর্ব;* ঢাকা, ১৯৯৪।

সোমেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার বাউল: কাব্য ও দর্শন;* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৭১।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়;*

হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা; ঢাকা*, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫।

হারান চন্দ্র রক্ষিত, *ভিক্টোরিয়া যুগে বাংলা সাহিত্য;* কলকাতা, ১৩১৮।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, *কবিচরিত*, কলকাতা, ১৮৬৯।

হুমায়ুন কবির, *বাংলার কাব্য*, কলকাতা, ১৯৪২।

Bose, Buddhadeva, *An Acre of Green Grass;* Calcutta, 1948

Block, Jules, "La Litterature bengalie", Encyclopedie de la Pleiade: *Histoire des Litteratures;* t.i; Paris, 1955.

Chatterjee, SK. *Origin and Development of Bengali Language; Calcutta*, 1926; *Languages and Literatures of India;*....."Review of Qureshis *Etude....*" (Calcutta, November 28, 1972) *Melanges M.S.Q;* Dhaka, 1997

Day, Ar.Cy. *The Literature of Bengal;* Calcutta, 1877

De, SK., *History of Bengali Literature in the 19th Century;* Calcutta 1919

Dasgupta, S.B. *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature;* Calcutta, 1946

Dimock, E.C., *A Study of the Vaishnava-Sahajiya Movement of Bengal;* Ph.D. Thesis, Harvard, 1959.

Das Gupta, H.M., *Studies in Western Influence on the 19th Century Bengali Poetry* (1857-1887); Calcutta, 1914.

Dutt, R.C., *Cultural Heritage of Bengal- A Biographical and Critical History from the Earliest Times closing with a View of Intellectual Progress under British India;* Calcutta, 3rd edn., 1962

Glasenapp, H.de, *Les Litteratures de l'Inde, des origines a l'epoque contemporaine;* French Translation from German by R. Sailley; Paris, 1963.

Gokak, V.K. (ed.) *Literature in Modern Indian Languages; Delhi,* 1957.

Gosh, J.C., *Bengali Literature;* London: Oxford, 1948.

Hasan, M., *East Pakistan; A Cultural Survey;* Karachi; PEN, 1955.

Jamal, Begum Yusuf, *Poems from East Bengal,* Karachi; PEN, 1954.

Kabir, Humayun, (ed.) *Green and Gold: Stories and Poems from Bengal;* London, 1958 *Studies in Bengali Poetry;* Bombay, 1962 *Bengali Novel,* Calcutta, 1968

Khan Sarwar Murshid, (ed.) *Contemporary Writing in East Pakistan;* Dhaka, 1960

Kvaerne, *P., An Anthology of Buddhist Songs;* Oslo, 1977.

Long, J., *A Descriptive Catalogue of Bengali Works;* 1855.

Kazi Abdul Mannan, *The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal;* Dhaka, 1965.

Kazi Abdul Wadud, *Creative Bengal;* Calcutta, 1950.

Macdonald, A.A., *India's Past: Survey of her Literatures, Religions, Languages and Antiquities;* London, 1927

O'Connell, J.T. *Social Inplications of the Gaudiya Vaishava Movement;* Ph.D. Diss., Harvard, 1978.

Preinhelterova, H. Review of Qureshi's *Poemes Mystiques Bengali;* (Published in *Archiv* Orientalni). *Melanges M.S.Q;* Dhaka, 1997.

Qureshi, Mahmud Shah, "Les Litteratures du Pakistan, *Grande Encyclopedie Larouss,* Pais, 1970, Vol. XI *Etude Sur L'evolution intellectuelle chez les Musulmans du Bengale,* 1857-1947; *Paris, 1971. Poemes Mystiques Bengali;* Paris: Unesco, 1977 *Culture and Development,* Dhaka, 1982

Ray, Annada Shankar & Lila Ray, *Bengali Literature;* Bombay, PEN, 1942

Ray, Lila, *A Challenging Decade: Bengali Literature in the Forties,* Calcutta, 1953

Renou, L; *Les litteratures de l'Inde;* Paris, 1951.

Rowlands, J.H., *La femme bengalie dans la Litterature du Moyen-Age;* Paris, Doct. Diss., 1930.



Sarkar, Indira, *Socio-Literary Movements in Bengali and French;* Calcutta, 1948, *Social Thought in Bengal* (1757-1947); *A Bibliography of Bengali Men and Women* of Letters; Calcutta, 1949.

Sen, D.C., *History of Bengali Language and Literature;* Calcutta, 1911. *The Vaishnava Literature of Medieval Bengal; Calcutta, 1917. The Folk Literature of Bengal;* Calcutta, 1920. *East Bengal Ballads;*

Sen, P.R. *Western Influence in Bengali Literature;* Calcutta 1932

Sen, Sukumar, *History of Bengali Literature,* Delhi 1960.

Shahidullah, M., *Textes pour l'etude du Bouddhisme tardif. Les chants mystiques de Kanha et de Saraha;* Paris, 1928.

Syed Ali Ahsan, *The Literary Scene in East Pakistan,* Dhaka, PEN, 1955.

*Syed Ali Ashraf, Muslim Tradition in Bengali Literature* Karachi, 1960 "Pakistani Drama--- Bengali, *World Encyclopaediz of Drama;..... Literature, Society and Culture in East Pakistan from 1947 to 1971;* Karachi, 1977.

*Under the Green Canopy;* Lahore : Afro-Asian Book Club, 1966.

Zbavitel, Dusan, *Bengali Literature; A History of Indian Literature*-Gen. Editor, J. gonda; Wiesbaden, 1976

# বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা

সৈয়দ আলী আহসান

বাংলা সাহিত্য অনেক দিনের, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কার্যক্রম শুরু হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে। এদেশের মানুষ তাদের সাহিত্যের নানাবিধ উপকরণের সঙ্গে সব সময়ই পরিচিত ছিল, কিন্তু সে পরিচয়টি বিধিবদ্ধভাবে একটি ধারাক্রমের মধ্য দিয়ে তাদের সামনে উপস্থাপিত ছিল না। দীর্ঘকাল এদেশের মানুষ বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং এই পদাবলী একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর জনসমষ্টির কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত ছিল এবং অনুসরণীয় ছিল। শুধু বৈষ্ণব-পদাবলী কেন মধ্যযুগের ধর্মীয় উপাখ্যানগুলো সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রামায়ন-মহাভারতের কাহিনী সংস্কৃত থেকে অনূদিত হয়ে হিন্দু পাঠক-পাঠিকার কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত ছিল। কিন্তু এগুলোর কোনটাই একটি বোধযোগ্য শৃঙ্খলা এবং পরম্পরাযুক্ত ক্রমধারায় পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়নি। এদেশে ইংরেজ আগমনের পরে এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ক্রমশ ইংরেজী সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে আমাদের পরিচয় ঘটে এবং আমরা ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের যুগবিভাগের পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যের উপকরণগুলো সন্ধান করতে থাকি। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস একটি বলিষ্ঠ এবং ব্যাপক চর্চার মধ্য দিয়ে সেকালে বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিতে সাহিত্যকে চিহ্নিতকরণের একটি প্রক্রিয়া ইংরেজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে হয়েছিল। রাজনৈতিক ইতিহাসটি এককভাবে সাহিত্যের ইতিহাসের পশ্চাদভূমি নির্মাণ করেনি, সে সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সামাজিক ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক এবং প্রকৌশলগত আবিষ্কার এবং বিভিন্ন প্রকৃতির অর্থনৈতিক আচরণ। সাহিত্য যেহেতু এক সময়কালের সৃষ্টি, সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় সময়কালের পরিচয় উদঘাটন একান্ত প্রয়োজনীয় বলে গৃহীত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজী সাহিত্যের রেস্টোরেশন-পর্বের কথাই ধরা যাক। রেস্টোরেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে পুনঃস্থাপন। আসলে এটা ছিল ইংল্যান্ডের সিংহাসনে স্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনপ্রতিষ্ঠার আমল। রাজা প্রথম চার্লস নিহত হবার পর ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র ভেঙ্গে যায়, তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চার্লস, যাকে 'বনি প্রিন্স চার্লি' বলা হত, তিনি তৎকালীণ ফ্রান্সের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে



অনেক কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক ফ্রান্সে এসেছিলেন। দ্বিতীয় চার্লস ইংলান্ডে ফিরে এসে সিংহাসনে আসীন হন ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের স্বভাব ও রূপ পাল্টে যায়। প্রচুর পরিমাণে ফরাসী শব্দ ইংরেজী ভাষায় প্রবেশ করে এবং ফরাসী নাটকের ধাঁচে নতুন স্বভাবের ইংরেজী নাটক রচিত হতে থাকে এবং মঞ্চস্থ হতে থাকে। এই যে ইংরেজী সাহিত্যের পরিবর্তনটি এলো এ পরিবর্তনটা এসেছিল কিন্তু দ্বিতীয় চার্লসের প্রত্যাবর্তনের ফলে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের ইতিহাসটি গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় জীবনের ইতিহাসকে অনুসরণ করে এবং একটি বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রীয় বোধ ও ধারাক্রমের প্রজ্ঞা ও প্রতীতীকে অবলম্বন করে। ইংরেজী সাহিত্য এভাবেই বিভিন্ন সময়ে তার রাজনৈতিক ধারাকে অনুসরণ করে যুগবিভাগ নির্মাণ করেছে এবং উক্ত যুগবিভাগ সাহিত্যধারার স্বরূপ প্রকাশকও হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম যখন রচিত হল তখন ইংরেজী সাহিত্যের ধারাক্রম ও যুগবিভাগটি আমাদের জন্য আদর্শ স্থানীয় হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন দীনেশ চন্দ্র সেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। সুতরাং তার পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের পদ্ধতি অনুসরণ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়াস পান। তাঁর সময়কালে যে সমস্ত উপকরণ তিনি গ্রহণ করেছিলেন সে উপকরণগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত হয়নি বলে তিনি তাঁর ইতিহাসে যে ধারাক্রম নির্মাণ করেছিলেন তাতে অনেক ত্রুটি ছিল। পরবর্তীতে তাঁর গ্রন্থটি কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু তবুও মূলে অনেক উপকরণের অভাব থাকার দরুন পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এই অভাবটি পুরোপুরিভাবে দূরীকৃত হয়নি।

আমাদের ইতিহাস রচনার অনেক সমস্যা রয়েছে। ইতিহাসের একটি যুগবিভাগ থাকে। সেই যুগবিভাগকে অনুসরণ করে সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে রাজনৈতিক সময়কালটি অস্পষ্ট, সেখানে সাহিত্যের সময়কাল যথাযথভাবে আমরা কি করে নির্ধারণ করব? তাছাড়া বাংলাভাষাগত অঞ্চলগুলোর একটি আঞ্চলিক ইতিহাস আছে, আবার কখনও কখনও তা সর্বভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সমন্বিতও রয়েছে। এ দুটি প্রকরণ একত্রে মিলিত হয়ে একটি জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে যার ফলে বাংলা সাহিত্যকে সময়ের কোন ধারাক্রমে কিভাবে সংস্থাপিত করব এটা একটা সমস্যার ব্যাপার। এর উপরেও আর একটি কথা আছে। সেটা হচ্ছে উপকরণের অভাবে কোন কোন যুগ গুরুত্ব পায় না। সেসব ক্ষেত্রে উপকরণ সংগ্রহের কাজ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের কাজ হিসেবে গৃহীত হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ পাল

আমল, সেন আমল এবং বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পর প্রাথমিক পর্যায়ের নবাবী আমলের কথা আমরা আমাদের চিন্তায় আনতে পারি। এই তিনটি সময়কাল একত্রে মিলিত হলে অনেকটা দীর্ঘ সময় আমরা পাই- প্রায় আটশ' বছরের মত। এই দীর্ঘ কালে সাহিত্য সম্ভার যা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তা অত্যন্ত নগন্য। সেই কারণে এ সমস্ত সময়কালের সাহিত্যের উপকরণ নতুনভাবে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।

অনেকে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এর ফলে যে বিশ্বাসের প্রতি তার সমর্থন আছে, সে বিশ্বাসের সঙ্গে পোষকতা করে এমন অধ্যায়টি অথবা পর্বটি প্রাধান্য লাভ করে। এর ফলে সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বৈষ্ণবীয় আবেশে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল যে ইতিহাস লেখকগণ শ্রী চৈতন্যকেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যমনি করে রেখেছিলেন। এটা সত্য যে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কাব্যধারায় বৈষ্ণব ভাব-প্রকল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটাও সত্য যে শ্রী চৈতন্যের সম্মোহন না থাকলে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র গড়ে উঠতো না। কিন্তু তাই বলে বৈষ্ণবীয় কাব্যকে এককভাবে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধান মর্যাদা দিলে চলবে না। এক সময় বন্যার মত এ আবেগ বাঙালী মানুষকে প্লাবিত করেছিল, কিন্তু তার ধারা প্রবাহ এখন আর বিদ্যমান নেই, এর কোন পুনরাবির্ভাবও পরবর্তী যুগে ঘটেনি। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, বৈষ্ণবীয় সাহিত্য একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে এ আবেগের প্রভাব এবং প্রসার অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েনি। সেই কারণে যিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করবেন তিনি অবশ্যই বৈষ্ণব সাহিত্যকে একটি বিশেষ সময়কালের সাহিত্য ধারায় বিশেষ মর্যাদা দেবেন, কিন্তু তাই বলে শ্রীচৈতন্যকে বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা কেউ বলবে না। আহমদ শরীফ সাহেব তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যকে এবং রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যকর্মের মূল প্রেরণা বলেছেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র ইতিহাসে এটা প্রমাণিত করতে পারেননি। মধ্যযুগ সম্পর্কে আহমদ শরীফের পাণ্ডিত্য অগাধ। বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকের সময়কাল নিয়ে এবং তাঁদের রচনার যথাযথতা নিয়ে তিনি মুল্যবান গবেষণা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এর প্রয়োজন আছে কিন্তু সাহিত্যকর্মের তাৎপর্য নিরীক্ষণের এটাই একমাত্র মাপকাঠি নয়। আহমদ শরীফের রচনায় অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে সময়কাল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং পাঠের যথার্থতা নির্ধারণ। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসকে জীবনাশ্রয়ী হতে হয়। জীবনাশ্রয়ী না হলে ইতিহাসটি অসম্পূর্ণ থাকে। ইতিহাস-লেখককে এদিকে লক্ষ্য দিতেই হয়।



আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগটি একটি কঠিন সমস্যা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি যুগের আদর্শগত ও জীবনগত প্রত্যয় প্রকাশ পায়। সে কারণে যখনই যুগ-বিভাগ করা হবে তখনই প্রতিটি যুগের সাহিত্যের উপাদান সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয় হতে হবে। অনেক দেশে একটি জাতির ইতিহাস সাহিত্যের মধ্যে অনুসন্ধান করা হয়। এই সাহিত্যের মধ্যে লোকসাহিত্য থাকে, সাহিত্যের লিখিত উপাদান থাকে এবং কবিতা-গান-নাটক সব কিছুই থাকে। এগুলোর মধ্য দিয়ে একটি সময়ের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, প্রশাসন প্রণালী এবং কর্মব্যবস্থাপনার ধারাক্রম আবিস্কার করা যায়। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস পুরোপুরিভাবে একটি জাতির নয়। সে কারণে গুরুত্ব দেওয়া হয় লিখিত উপকরণের উপর। উপরন্তু সে উপকরণগুলিও তত্ত্ব এবং শৈলীর দিক থেকে যাচাই করে গ্রহণ করা হয়। সেজন্য সাহিত্যের ইতিহাস সামগ্রিকভাবে একটি ভাষার সকল প্রকার লিখিত উপাদানের ইতিহাস নয়। এর মধ্যে নির্বাচনের কথাটাও থাকে। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ যাকে আমরা বলি সে যুগের ইতিহাসটাও আমাদের সামনে খুব বেশী স্পষ্ট নয়। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ এই যুগটাকে প্রায় অপরীক্ষিত রেখে দিয়েছেন। আমি সাম্প্রতিককালে 'চর্যাগীতিকা' এবং কয়েকজন কবির 'দোহাকেষ' পরীক্ষা করতে গিয়ে সচেতন হলাম যে, আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন যুগের উপকরণের অভাব খুব যে ছিল তা নয়। এসময়কালটি ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যেতে পারে। এসময়কালের শুরুতে পাল বংশীয়দের রাজত্ব ছিল এবং একেবারে শেষের সত্তর বছর বহিরাগত সেনদের শাসন ছিল। বখতিয়ার খিলজির বাংলাদেশ অধিকারের পর একটি নতুন যুগের ধারাক্রম আরম্ভ হল। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে যুগটির আরম্ভ সে যুগের নামকরণ কয়েকটিভাবে করা যেতে পারে। একটি হতে পারে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষের যুগ' (৮০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ); আরেকটি হতে পারে 'বৌদ্ধ বা পাল রাজত্বকাল' এবং 'সেন রাজত্বকাল' (৮০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ); অথবা হতে পারে 'আদিযুগের সাহিত্যে ধর্মগত অভিপ্রায়' (৮০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)। আদিযুগের তিনজন কবি চর্যাপদ রচনা ছাড়াও দোহাকোষ রচনা করেছিলেন। এরা তিনজন হচ্ছেন- সরহপা, কাহ্নপা এবং তিলোপা। অল্পস্বল্প আঞ্চলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এঁদের তিনজনের মধ্যে মিল আছে। এ অঞ্চলে তৎসময়ে, প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষায় এরা এঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন। এই অপভ্রংশকে পূর্বী অপভ্রংশ বলাই সঙ্গত। পূর্বী অপভ্রংশই ছিল বাংলা ভাষার আদিরূপ। এই অপভ্রংশের সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত অনেকটা মিল আছে। যেমন, ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে তালব্য 'শ' এবং মূর্ধণ্য 'ষ'-এর উচ্চারণ ছিল না। বাংলার মতো দন্ত 'স' এর উচ্চারণ ছিল তালব্য 'শ' এর মত। তেমনি অন্তঃস্থ 'য' এর

উচ্চারণ বাংলা বর্গীয় 'জ' এর মত ছিল। হিন্দীতে দুটি 'ব' পাওয়া যায়। একটির উচ্চারণ 'ব' অন্যটির উচ্চারণ 'ওয়া'। কিন্তু পূর্বী অপভ্রংশের ভাষায় আমরা বাংলার মত একটি উচ্চারণ পাচ্ছি 'ব'। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যে দোহাকোষগুলোকে বাংলা ভাষার আদিরূপ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তাই এগুলোকেও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। 'ডাকার্ণব' বলে একটি পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে পেয়েছিলেন। এটা নিয়ে কোন বিশ্লেষণ বাংলা ভাষায় হয়নি। এটা মূলত ডাকের বচন। এ উপকরণগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি আবিষ্কার করতে পারি। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে চর্যাগীতি, দোহাকোষ, ডাক, ও খনার বচন এগুলো বাংলাদেশ সংলগ্ন অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের ভাষার স্বভাবের সঙ্গেও মেলে। যেমন, অহমিয়া এবং উড়িয়া। তাছাড়া এগুলো নিয়ে অহমিয়া ভাষার, হিন্দী ভাষার এবং উড়িয়া ভাষার সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ গবেষণা করেছেন। সুতরাং বাংলা ভাষার আদিযুগের সাহিত্যের প্রকৃতি জানতে হলে আমাদের ইতিহাসকারগণকে হিন্দী ভাষা, অহমিয়া ভাষা এবং উড়িয়া ভাষার সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাথমিক উপকরণগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এটা অদ্যাবধি কেউ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে করেননি।

বাংলা সাহিত্যের অনেক উপকরণের সঙ্গে বিভিন্ন যুগে অন্যান্য কয়েকটি ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের উপকরণের মিল আছে। এই মিলটি পরীক্ষা করে দেখা দরকার এবং ইতিহাসের যথাযথতা নির্মাণের প্রয়োজনে অন্যান্য ভাষার উপকরণগুলো অনুসন্ধান করতে হবে। যেমন ধরা যাক, বিদ্যাপতির কাব্যকলা। বিদ্যাপতি যেহেতু বাঙালী কবি নন, মৈথিলী কবি, সুতরাং মৈথিলী ভাষায় বিদ্যাপতির উপকরণ কী আছে তা আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। বর্তমানে হিন্দী ভাষায় বিদ্যাপতি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। বাংলা দেশের ইতিহাসকারগণকে সেগুলো জানতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করতে হবে। শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে যেমন বাংলা ভাষায় একটি বিরাট জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তেমনি উড়িয়া ভাষায় মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের একটি উল্লেখযোগ্য জীবনী সাহিত্য আছে। এই জীবনী-সাহিত্য আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং বাংলায় চৈতন্যের যে জীবনী সাহিত্য আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এটা কিন্তু আমরা কখনও করছি না। এটারও কিন্তু প্রয়োজন আছে। একটি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা সর্বাঙ্গীনভাবে তখনই সফল হবে যখন সকল ক্ষেত্রে এর উপকরণ আমরা সংগ্রহ করতে পারব। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন এবং মধ্য যুগের ইতিহাস এখনও পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন নয়।



ইতিহাসকারগণকে এদিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। এখানে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অসম্পূর্ণতা আছে।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বৃহদায়তন ইতিহাস গ্রন্থের, অনেক সময় যুথবদ্ধ কয়েকজন লেখকের প্রয়োজন হয়। একেকজন একেক অধ্যায় সেখানে লেখেন। যিনি যে বিষয়ে পারঙ্গম তাকে সে বিষয়টি দেওয়া হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি বিরাট সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে একটি ভাবগত এবং রচনা শৈলীগত সম্পর্ক স্থাপন। এ সম্পর্কটা না ঘটলে অধ্যায়গুলো পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং একটি সমন্বিত ইতিহাস তৈরী হবে না। এ সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে একজন প্রধান সম্পাদকের উপর ন্যস্ত করা হয়ে থাকে। যদি প্রধান সম্পাদক একটি সঙ্কলনের মত করে প্রবন্ধগুলো সাজিয়ে যান এবং রচনাগুলোর অভ্যন্তরীন বিন্যাসে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে ইতিহাস গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ হবে না। বাংলা একাডেমী কিছুদিন আগে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একটি ইতিহাস প্রকাশ করেছে। এই ইতিহাস গ্রন্থটিতে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। তাছাড়া বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে শৈলীগত পার্থক্য এত প্রবল যে সমগ্র গ্রন্থটিতে একটি আড়ষ্ঠভাব পরিলক্ষিত হয়। যিনি প্রাচীন যুগের ভৌগলিক পরিবেশ বিষয়ে লিখেছেন তিনি ভূগোলের একজন বিশেষজ্ঞ, কিন্তু বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই, তার ফলে এ রচনাটি প্রাচীন বাংলার ভৌগলিক বিবরণের কথাই আছে মাত্র, কিন্তু তার মধ্যে সাহিত্যের স্থান চিহ্নিত করা হয়নি। চর্যাগীতিকাগুলোর মধ্যে নদীমাতৃক একটি দেশের পটভূমি আছে। আবার, কোথাও কোথাও পর্বতের সানু দেশের বিবরণ আছে, আবার উঁচু উঁচু পর্বতের কথাও আছে। সরহপা তার দোহাকোষে তাঁর জন্মভূমিকে 'পূর্বদিশা' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'পূর্বদিশা' কোথায় ছিল? তা ভৌগলিক বিবরণের মধ্যে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করতে হবে। তৎকালীন সাহিত্য কর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করলে বাংলাদেশের সে সময়কার ভূগোলের পরিচয় যথাযথ হবে না। একাডেমী প্রকাশিত গ্রন্থে এ অধ্যায়টি যিনি লিখেছেন তাঁর পান্ডিত্য নিয়ে আমি সংশয় প্রকাশ করছি না, কিন্তু যিনি সম্পাদক তাঁর দায়িত্বের অভাব থেকে আমি দুঃখবোধ করছি। একই অবস্থা ঘটেছে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস অধ্যায়ের ক্ষেত্রেও। সেখানে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের নানা ধরনের অনুসন্ধান আছে কিন্তু তৎকালীন সাহিত্যের প্রসারের সীমারেখার সঙ্গে এই ইতিহাসের কোন সম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়নি। যিনি লিখেছেন তিনি ইতিহাসের একজন দক্ষ পন্ডিত, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তার ফলে এটাও

একটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ হয়েছে। কিন্তু মূল গ্রন্থের ধারাক্রমের সঙ্গে সমন্বিত হতে পারেনি। অপ্রাসঙ্গিকভাবে অন্য একটি অধ্যায় এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কতকগুলো সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ দিয়ে একটি অধ্যায় তৈরী হয়েছে। এই পুঁথিগুলির সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রন্থটি পরীক্ষা করতে এ অধ্যায়টি দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়েছি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য আলোচনা করতে গেলে কিছু সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে এটা আমি স্বীকার করি। চর্যাগীতিকার রচয়িতাদের অনেকে সংস্কৃত ভাষায় বহু তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলোর পরিচিতি থাকা অপ্রাসঙ্গিক হত না। এক্ষেত্রে আমি গ্রন্থের সম্পাদককে দায়ী করব। তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন বলে আমার মনে হয় না। একারণেই আমি বলতে চাই যে সাহিত্যের ইতিহাস এককভাবে একজন লেখকেরই হওয়া উচিত। বিভিন্ন লেখকের লেখা নিয়ে একটি সঙ্কলন গ্রন্থকে সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে উপস্থিত করা যথাযথ হয় না। শুনতে পাই যে বাংলা একাডেমী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে এরকম একটি সঙ্কলন গ্রন্থ তৈরী করেছেন। সে গ্রন্থটিও প্রথম গ্রন্থটির মত একটি কিম্ভূতকিমাকার সঙ্কলন হলে খুবই দুঃখের হবে।

বাংলা সাহিত্য একটি বহুবচনাত্মক মানবগোষ্ঠীর সাহিত্য। এই বহুবচনের মধ্যে বৌদ্ধ আছে, হিন্দু আছে এবং মুসলমান আছে। এদের সাহিত্যে প্রকৃতিগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। যিনি ইতিহাস রচনা করবেন, তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন ধর্মের হবেন, কিন্তু তাঁকে পরিপূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতাবোধ মুক্ত হতে হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে অনেক হিন্দু মনীষী সাম্প্রদায়িক আবেশ মুক্ত হতে পারেননি। এঁদের অনেকেরই দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ নয়। তেমনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে নিরপেক্ষতা লক্ষ্য করা যায় না। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য। এঁরা যে মুসলমান-বিদ্বেষী অথবা হিন্দু-বিদ্বেষী তা নন। কিন্তু এঁদের প্রবণতা হচ্ছে স্ব-সমাজের লোকদের অনুকূলে কথা বলা। এদিক থেকে আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সুকুমার সেনকে প্রশংসা করি। তিনি তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে এই অসম্পূর্ণতা দূর করবার জন্য *ইসলামী বাংলা সাহিত্য* বলে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে- এক সময় তার পিতা-পিতামহ যে সমস্ত কাব্য কাহিনী পাঠ করে মুগ্ধ হতেন সেগুলোকে অবহেলা ভরে অস্বীকার করা যায় না। তাই তিনি বিনয়-মমতার সঙ্গে এ সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থিত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে মধ্যযুগের সাহিত্যের উপকরণগুলো সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গে নেই। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ



বর্তমান বাংলাদেশে মধ্য যুগের মুসলমান কবিদের অনেক রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান নগন্য ছিল না। যাঁরা মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করবেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গেরই হোন আর বাংলাদেশেরই হোন তাঁদের উভয়েরই এ উপকরণগুলো ব্যবহার করতে হবে। এটি পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং এক্ষেত্রে যথার্থ অনুসন্ধিৎসা এবং আন্তরিকতা প্রয়োজন। অবশ্য অনেকের আন্তরিকতা থাকলেও সুযোগের অভাবে বাংলাদেশে রক্ষিত উপকরণগুলো বিবেচনা করবার সময় পান না। এতে তাঁদের সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও খন্ডিত থাকে। আমি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানব সমাজের একাধিকত্বের কথা উল্লেখ করেছি যাকে বহুবচন বলেছি-সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই বহুবচনগত সমতাবোধ আমাদের ইতিহাসকারগণের থাকতেই হবে। অনেক সময় মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায় যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেগুলো আছে সেগুলোতে বাংলা সাহিত্য-কর্মে মুসলমানদের দানকে ইচ্ছাকৃতভাবে খর্ব করে দেখানো হয়েছে। এটা ইচ্ছাকৃত নাও হতে পারে এবং তথ্যের অভাবজনিত কারণেও এটা হতে পারে। এটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একটি সামগ্রিকতা আছে, যেখানে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং মুসলমান সবারই আবেদন একই মর্যাদায় বিবেচিত হতে বাধ্য। ইংরেজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি নেই, ফরাসী কিংবা জার্মান সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নেই। কিন্তু স্পেনীশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আছে, আমেরিকান সাহিত্যের ক্ষেত্রে আছে এবং তুর্কী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আছে। স্পেনে দীর্ঘকাল মুসলমান শাসন ছিল এবং সে শাসনামলে স্পেনে একটি উন্নতমানের আরবী সাহিত্যধারা তৈরী হয়েছিল। বর্তমানকালের স্পেনীশ সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধারাটির উল্লেখ নেই। স্পেনীয় সাহিত্যের ইতিহাস বর্তমানে শুধু স্পেনীয় খ্রীষ্টানদেরই ইতিহাস, মুসলমানদের কথা সেখানে নেই। সম্প্রতি ক্যাটালনীয় অঞ্চলের কিছু গবেষক এদিকে সবাইকে দৃষ্টি ফেরাতে বলেছেন এবং স্পেনের প্রাচীন আরবী সাহিত্যের ঐতিহ্য উদ্ধার করতে বলেছেন। আমেরিকায় নিগ্রোদের একটি বিরাট সাহিত্য আছে। আমেরিকার সাহিত্যের যেসব ইতিহাস লিখিত হয়েছে সে সমস্ত ইতিহাসে নিগ্রোদের সাহিত্যের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে নেই। সে কারণে বর্তমানে নিগ্রোদের রচিত সাহিত্য নিয়ে আলাদা গ্রন্থ রচিত হচ্ছে এবং বর্তমানে নিগ্রো সাহিত্যকে শ্বেতকায় মানুষের সাহিত্যের সমতলে এনে ফেলবার প্রয়াস চলছে। তুরস্কেও দু'ধরনের সাহিত্য তৈরী হয়েছিল। একটি আরবীতে, অন্যটি তুর্কী ভাষায়। সেখানেও সাহিত্যকারদের সামনে একটি প্রশ্ন ছিল যে, আরবী ভাষার সাহিত্য কি তুর্কী ভাষার অন্তর্ভুক্ত হবে? এ প্রশ্নের সমাধান সেখানে এখনও

হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিছু সাহিত্যের সঙ্কলন গ্রন্থ সে দেশে প্রকাশিত হচ্ছে সেখানে আরবী এবং তুর্কী উভয় ভাষার সাহিত্যের নিদর্শন আছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান রচিত সাহিত্যের মধ্যে ভাষাগত কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু সমর্থনগত গুরুত্বের তারতম্য আছে। এই তারতম্যটা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সুকুমার সেনের মত পন্ডিত ও মহানুভব ব্যক্তির ইতিহাসেও অনেক মুসলমান সাহিত্যিককে প্রাপ্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়নি। মধ্যযুগের ক্ষেত্রে এটা সত্য, আধুনিককালের ক্ষেত্রে এটা অধিকতর সত্য। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে এবং বর্তমান বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে যে সমৃদ্ধমান ধারা গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ সুকুমার সেনের ইতিহাসে নেই। এখানকার উপন্যাস এবং কথা সাহিত্যকেও তিনি বিবেচনার বাইরে রেখেছেন। অর্থাৎ তার সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক পর্বটি সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সাহিত্যের ইতিহাস হয়নি, হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। আঞ্চলিক ভাষার গবেষণার ক্ষেত্রে এবং প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমগ্র বাংলাদেশ বাদ যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের গবেষকদের বিবেচনা থেকে। তেমনি আবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক ভাষার প্রকৃতি বাংলাদেশের গবেষকরাও অনুসন্ধান করতে পারছেন না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনেক আগে ১৯৬২ সালের দিকে আমাকে দুঃখ করে লিখেছিলেন যে বাংলা ভাষার একটি সামগ্রিকতা আছে, কিন্তু এখনও আমরা তার প্রতি সম্মান জানাতে পারছি না। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও খন্ডিত হয়ে গেল। আঞ্চলিক ভাষার উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তান নিজস্ব সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং পশ্চিমবঙ্গও একইভাবে নিজস্ব সীমানার মধ্যে খন্ডিতভাবে থাকবে। ঢাকায় বাংলা একাডেমী তখন আঞ্চলিক ভাষার অভিধান তৈরী করছিল; আমি তখন সে উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা জরিপ করার ব্যাপারে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তা চেয়ে একটি পত্র লিখেছিলাম। তার উত্তরে উপরের মন্তব্যটি তিনি করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বিষয়বস্তুগত গুরুত্ব কিভাবে নির্ধারণ করা হবে। এক সময় হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যই অত্যন্ত গুরুত্ব পেত। বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য এগুলোই ছিল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে উপকরণ। বৈষ্ণবর সাহিত্য-সূত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল চৈতন্যের জীবনীকাব্য। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা আরম্ভ করি ১৯৪৯ সালে তখন মধ্যযুগের সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের আমাকে পড়াতে হয়েছিল- 'চৈতন্য ভাগবত', 'চৈতন্য চরিতামৃত', 'শ্রী কৃষ্ণকীর্তন' এবং 'বৈষ্ণব পদাবলী'। তখন



সাহিত্যের ইতিহাসে এ বিষয়গুলোই গুরুত্ব পেত, কিন্তু এখন আর এগুলোর গুরুত্ব তেমন নেই। সুতরাং এখন যিনি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করবেন তাকে বৈষ্ণব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। এর বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে নানাবিধ অনুসন্ধানের পর আমরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনেক রোমান্টিক কাব্য কাহিনীর সন্ধান পেয়েছি। এগুলো ক্রমশ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিচ্ছে এবং নেবে। তাছাড়া বর্তমানে আমরা সামগ্রিকভাবে বৈষ্ণব পদাবলী পড়াবার গুরুত্ব অনুভব করি না। বৈষ্ণব-পদাবলী রচয়িতাদের মধ্যে কেবল তিনজনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি বিদ্যাপতি, বড়ু চন্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস। অন্যান্যরা যেগুলো পদ লিখেছেন সেগুলো সবই ছিল প্রথাগত রচনা, সেগুলোর কোন কাব্যমূল্য নেই বললেই চলে। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসকারগণকে বর্তমানে খুব সচেতনভাবে বিষয় নির্বাচন করতে হবে। আগেকারমত ধর্মীয় আচরণ বিধির সঙ্গে সাহিত্যকে সম্পৃক্ত রাখলে চলবে না। সমস্যা হয়েছে এই যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যখন থেকে লিখিত হতে আরম্ভ হল- উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে, তখন গবেষকগণ যে সমস্ত উপকরণ পেয়েছিলেন তার মধ্যে প্রভূত উপকরণ ছিল বৈষ্ণব সাহিত্যের। 'পদকল্পতরু' ছিল এর একটি বিরাট উপকরণ। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ এগুলোর উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশী। বর্তমানে আরও অনেক উপকরণ এসেছে আমাদের হাতে, মধ্যযুগের রোমান্টিক কাহিনীর হিন্দী-অবধী পটভূমি সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বগত ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তখন দেখা দিয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাস শুধু সন-তারিখের ইতিহাস নয় এবং লেখকদের শুধুমাত্র পরিচিতিও নয়। সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যের বিচারও থাকতে হবে। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের পারস্পরিক তুলনাও থাকতে হবে। সাহিত্যের ইতিহাস এমনভাবে রচিত হবে যেন ইতিহাসের পাঠক শুধুমাত্র কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকাল এবং গ্রন্থাদির সঙ্গেই পরিচিত হবেন না, তাঁদের মধ্যে সাহিত্য বিচারের একটি বোধও জন্মাবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর অভাবটি খুব সুস্পষ্ট। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা লুঈ এবং ক্যাজামিয়াঁ তাঁদের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যের একটি তত্ত্বগত ও শিল্পগত বিশ্লেষণও করেছেন। যার ফলে এ গ্রন্থটি ইতিহাস ছাড়াও একটি পাঠযোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণের মধ্যে একমাত্র দীনেশ চন্দ্র সেন ছাড়া কেউই ভাষাশিল্পী, সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ এবং পূর্ণকাম সাহিত্য-রসিক নন। আমি কাউকে আঘাত দেবার জন্য একথাটা বলছি না, কিন্তু কথাটি দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অসাধারণ পন্ডিত ছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যকর্মের কোন

বিচার নেই, বিস্তর অনুসন্ধান অবশ্যই আছে। যেমন, কাল নির্ণয়, চন্ডীদাস সমস্যা ইত্যাদি। তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসটি উপকরণের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি মধ্যযুগের সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক একজন অত্যন্ত নীরস গদ্য-লেখক এবং তাঁর কোন রচনাতেই সাহিত্যের স্বাদ ও মাধুর্য নেই। এর ফলে তাঁর রচিত মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস পাঠযোগ্য গ্রন্থ হয়নি। সুকুমার সেন সম্পর্কে একটি কথা বলা যায় যে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে সারা জীবন তাঁর অসম্ভব কৌতূহল ছিল তাছাড়া এর উপরও তিনি ছিলেন একজন ভাষা বিজ্ঞানী। তাই তাঁর রচনা সহজ ও দ্রুতগামী। তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ নিয়ে কারও কারও মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের বিষয়ে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্নও করতে পারেন। কিন্তু তাঁর গদ্যশৈলী নিয়ে কোন প্রশ্নের সুযোগ নেই। তাছাড়া সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কারকে তিনি এমন সহজভাবে প্রকাশ করেছেন যে সেগুলোর দ্বারা পাঠক তাঁর পান্ডিত্য সম্পর্কে সপ্রশংস-সচেতন হন না। এভাবে নতুন তথ্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে সুকুমার সেনের বিনয়টি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের কয়েকজন অধ্যাপক এবং গবেষক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে কিছু কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যকার দু'একজনের নাম আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এঁদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন মরহুম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম সফল গবেষণা করেছেন। তিনি সরহপা এবং কাহ্নপা' চর্যা এবং দোহাকোষ নিয়ে ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় সাধন পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণা ১৯২৬ সালে প্যারিসে বসে করেন। তাঁর গবেষণা সন্দর্ভটি ১৯২৮ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর পূর্বে এ বিষয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। এঁরা উভয়েই চর্যাগীতিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন, কিন্তু দোহাকোষ নিয়ে কেউ কোন রূপ পরীক্ষা করেননি। এ পরীক্ষাটি সর্বপ্রথম করলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। পরে হিন্দীতে এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে কাজ হয়েছে এবং পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বত ভূখন্ডে গিয়ে চর্যাগীতিকা ও দোহাকোষের পান্ডুলিপির অনুসন্ধান করেন। তিনি প্রাপ্ত তথ্যাদির সাহায্যে সিদ্ধ সরহপা-র দোহাকোষ সম্পাদনা করেন। সঙ্গে হিন্দী ছায়ানুবাদ ছিল। তাঁর গ্রন্থটি বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ কর্তৃক ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এঁদের উভয়ের গবেষণালব্ধ তথ্যাদির উপর নির্ভর করে আমি ১৯৯৩ সালে সরহপার 'দোষাকোষ গীতি' অনুবাদ করি এবং বাংলা ভাষায় তা প্রথম উপস্থিত করি। সরহপা বাংলাদেশ অঞ্চলের আদি কবি। তাঁর ভাষা ছিল পূর্বী অপভ্রংশ। এ ভাষাই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, বাংলাভাষায় রূপান্তরিত



হয়েছে। আমার অনূদিত গ্রন্থটি সরহপার উপর বাংলা ভাষায় প্রথম প্রামান্য গ্রন্থ। আমি দোহাকোষের আক্ষরিক অনুবাদ করিনি, কিন্তু আধুনিক মানুষের গ্রহণযোগ্যতার কথা চিন্তা করে ভাবানুসরণ করেছি। যাঁরা বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ নিয়ে গবেষণা করবেন এবং আদিযুগ নিয়ে ইতিহাস রচনা করবেন তাঁদের শহীদুল্লাহর ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ, রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দী ভাষায় রচিত গ্রন্থ এবং বাংলা ভাষায় রচিত আমার গ্রন্থ- এই তিনটি গ্রন্থই অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রযাবতকাল পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যা উভয় বঙ্গে রচিত হয়েছে তাঁদের কোন একটিতে গ্রন্থগুলোর নিরীক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমি সম্প্রতি প্রারম্ভিক যুগের বাংলা ভাষার ইতিহাস রচনা করেছি তাতে আমি উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থই আলোচনায় এনেছি। শহীদুল্লাহর পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাঁর একমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ *আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য*। প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে এ গ্রন্থের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে এ গ্রন্থটি আর সংশোধিত হয়নি। তাই তথ্যগত এবং সন তারিখগত এবং কবিদের জীবন বৃত্তান্তগত প্রচুর ভুল এ গ্রন্থে রয়ে গেছে। সুতরাং গবেষকদের জন্য এ গ্রন্থটিকে প্রামান্য গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। এনামুল হকের অন্য একটি ইতিহাস গ্রন্থ *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য*। এ গ্রন্থটি বিভিন্ন পুঁথি পরিচিতির সাহায্যে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে লেখকের নিজস্ব কোন গবেষণা বা অনুসন্ধানের চিহ্ন নেই। তবে সাধারণভাবে মুসলমান সাহিত্যিকদের পরিচিতিমূলক গ্রন্থ হিসেবে এটাকে গ্রহণ করা যায়। আমি পূর্বেই একটি জায়গায় বলেছি যে এনামুল হকের ভাষায় একটি আড়ষ্ঠতা এবং ক্রুরতা আছে। সেকারণে তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলো খুব স্বচ্ছন্দ নয়। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের, বিশেষ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন ডঃ আহমদ শরীফ। এই প্রবন্ধের অন্যত্র একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বাংলাদেশের যে কয়জন ইতিহাসকার আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমি উল্লেখ করব। তাঁরা হচ্ছেন- মরহুম মুহম্মদ আবদুল হাই, কাজী দীন মুহম্মদ, মরহুম কাজী আবদুল মান্নান, মাহমুদ শাহ কোরেশী এবং আনিসুজ্জামান। আমি নিজে সাহিত্যের ইতিহাসে কাজ করেছি। আমার সর্বদাই লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যের যথার্থ স্বাদ উদঘাটন করা। আমি বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কলা-কুশলীদের রচনার বিষয় ও শৈলীগত স্বাদ উদঘাটন করবার প্রয়াস পেয়েছি। আধুনিক যুগের ইতিহাস আমি রচনা করেছিলাম মরহুম আবদুল হাইয়ের সঙ্গে। এখন সমগ্র গ্রন্থটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনা একা আমাকেই করতে হচ্ছে।

কাজী আবদুল মান্নান উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্যের সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে কিছু নতুন তথ্য দিয়েছিলেন। তদুপরি মীর মশাররফ হোসেনের উপর তাঁর কিছু গবেষণার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল। আনিসুজ্জামানের একটি গবেষণা গ্রন্থ (উনিশ শতকের) মুসলিম মানস এবং বাংলা সাহিত্য। তিনি একটি নতুন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের শিল্পকর্মকে পরীক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। মাহমুদ শাহ কোরেশীর গবেষণা কর্মটিও আধুনিক মুসলমানদের চিন্তাধারা সম্পর্কে। তাঁর গবেষণা কর্মটি ফরাসী ভাষায়। তিনি তাঁর গবেষণা-কর্মে মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের শিল্পগত ভাবনা ও ইসলাম ধর্মীয় চিন্তাধারাকে সমকালীন পটভূমিতে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। আরেকজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। তাঁর বিচার–বিবেচনার বিষয় ছিল উনিশ শতকের কাহিনী কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। তাঁর বিচার–বিবেচনা এবং বিশ্লেষণ অত্যন্ত নৈব্যক্তিক এবং আবেগমুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে সুকুমার সেনের পরে যারা ব্যাপকভাবে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ভূদেব চৌধুরী এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের ইতিহাসটিতে অহেতুক বিস্তার আছে, যার ফলে ইতিহাসের ধারাক্রমটি অনেক সময় হারিয়ে যায়। ভূদেব চৌধুরী তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ধীর, স্থির এবং সংযত। পশ্চিমবঙ্গে এখন আরও অনেকে হয়তো এসেছেন, কিন্তু তাঁদের ইতিহাস রচনার সঙ্গে আমি পরিচিত নই। সুতরাং তাঁদের রচনা সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে পারলাম না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা বিষয়ে যে কটি সমস্যা আমার বিবেচনায় ধরা পড়েছে সেগুলো নিয়েই আমি এ প্রবন্ধে আলোচনা করলাম। সংক্ষেপে সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) যুগবিভাগ সমস্যা; (২) উপকরণ সংগ্রহ এবং নির্বাচন সমস্যা; (৩) মুসলমান ও হিন্দু লেখকদের রচনা বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে গুণগত বিচারের সমস্যা; (৪) সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ গুরুত্ব নির্ধারণের সমস্যা। এছাড়া আরও অনেক সমস্যা থাকতে পারে যা হয়তো আমার মনে সুস্পষ্টভাবে জাগেনি। যাই হোক, যাঁরা নতুনভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় হাত দেবেন তাঁরা যদি এ সমস্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে ভাল হয় বলে আমি মনে করি।

# বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা

মনসুর মুসা

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে বিরাজমান কতিপয় সমস্যা বিশেষভাবে পরিচিহ্নিত করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সমস্যা ইতিহাসের সূচনা সম্পর্কিত বিতর্কে আছে, কাল-বিভাজনের যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে আছে, বিভাজিত কালে সাহিত্যকৃতির গুরুত্বের পারম্পর্যে আছে, তথ্যের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের ক্ষেত্রে আছে, উপাত্ত বিন্যাসের শৃঙ্খলায় আছে, আরো অনেক ক্ষেত্রে আছে। বিভিন্ন সাহিত্য শাখা সম্বন্ধে ইতিহাস রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, বাঙলাসাহিত্যের সামগ্রিকতা উপলব্ধির অন্তরায় ক্ষেত্রে আছে। সমস্যাগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য, কোনো সহজ সমাধান নির্দেশ করা নয়।

আধুনিক কালের মতো ইতিহাস-সচেতনতা বাংলাদেশের মধ্যযুগের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ছিল-এমন দাবী সচরাচর করা হয় না। যে পরিমাণ বিদ্যাচর্চা ছিল সে পরিমাণ ইতিহাসবোধ ছিল না। সেজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতো বিজ্ঞানবুদ্ধি সম্মত তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লেখার কাজ মধ্যযুগে খুব বেশী হয়নি। তবে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভের নিয়ামক হিসেবে সাহিত্য রচনার ঐতিহ্য বঙ্গদেশে ছিল। সুপ্রাচীন কালের কথা তেমন জানা না থাকলেও খ্রীস্ট-জন্মের পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এই অঞ্চলে লেখার ঐতিহ্য প্রবর্তিত হওয়ার ফলে নানা রকমের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে লোকভাষা সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে শাস্ত্রীয় ভাষা বৈদিক-সংস্কৃতের বাইরেও নানাভাষায় সাহিত্যচর্চা হয়েছে। সে যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকম সংকলন গ্রন্থ প্রচলিত হয়েছিল। বিভিন্ন কবি, গীতিকার, পদকর্তা যে-সব পাঠ- নির্মাণ করতেন, সেগুলো সংকলিত হতো, সংকলিত গ্রন্থের প্রতিলিপি হতো, প্রতিলিপি একস্থান থেকে অপর স্থানে নীত হতো। নির্মিত-পাঠ পঠিত হতো, ব্যাখ্যাত হতো এবং টীকাটিপ্পনী সহ পুনঃ পুনঃ সংকলিত হতো। তখনকার দিনের জ্ঞানবিস্তারের এই ছিল প্রথাসম্মত পদ্ধতি; জ্ঞানের দুয়ার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না- গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা direct method অনুযায়ী জ্ঞান এক প্রজন্মের অধিকার থেকে অপর প্রজন্মের

অধিকারে যেতো। জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্র ছিল সুনির্ধারিত, ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয় পরিমন্ডল অতিক্রম করে শুদ্র পর্যন্ত তার পরিব্যাপ্তি ছিল না। জ্ঞানচর্চা ছিল পরিশীলিত ও পরিসীমিত। সে কারণে যেসব পাঠ সংকলিত হতো সেগুলো সমাজের সীমাবদ্ধ স্তরে প্রচারিত হতো। *গাথা সপ্তশতী, আর্যা সপ্তশতী আর চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* এমনি ধরনের সংকলন গ্রন্থ। এই রকম আরো বেশ কিছু সংকলনের নাম পাওয়া যায়, প্রাকৃতেও আছে, অপভ্রংশেও আছে, দেশী অন্যভাষায়ও আছে। চর্যাপদের মধ্যেও ২৩ জন লেখকের পদ সংকলিত হয়েছে।

বিদেশাগত বহু গোত্রবদ্ধ জনসমষ্টি বঙ্গদেশে এসে বসত নির্মাণ করেছে, তুর্কীরা এসেছে, মোগলরা এসেছে, পাঠানরা এসেছে। কোন কোন গোত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে, ভূমির ওপর কর্তৃত্ব আরোপ করেছে। বাজার প্রতিষ্ঠা করেছে, গঞ্জ গড়ে তুলেছে। তারা স্বদেশ থেকে নানাবিধ কল্পকাহিনী ও গল্পকথা এদেশে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এদেশের ভাষা শিখে তারা সেইসব জিনিষ দেশী ভাষায় রূপান্তর করেছে। শাস্ত্রীয় ভাষা সংস্কৃতে সংরক্ষিত সাধারণ মানুষের অনধিগম্য অনেক কাহিনীও তারা দেশী ভাষায় প্রচার ও প্রসারের জন্য পাঠ-নির্মাতাদের প্রবর্তনা দিয়েছে। এইভাবে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে নানারকম পাঠ-নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। এর ফলে বঙ্গদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থলে, তীর্থস্থানে, নৌঘাঁটিতে, সামরিক দুর্গে, রাজধানীতে নানা ধরনের পাঠ-নির্মাণের সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠে। বঙ্গদেশের গৌড়, পান্ডুয়া, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, সোনারগাঁ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আরাকান প্রভৃতি স্থানে পাঠ নির্মাতাদের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। সে কালের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল নদীপথ-নির্ভর। নদীপথে বণিকেরা এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে পুথিপত্র কল্পকাহিনী নিয়ে যেতেন। গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, এক শ্রেণীর লোক জড়ো হয়ে এই সব পাঠ উচ্চস্বরে সুর করে পড়তেন, শুনতেন ও এইভাবে আনন্দ উপভোগ করতেন। কিন্তু এইসব নির্মিত পাঠ বা বইপত্রের ইতিহাস নির্মাণের কোনো চেষ্টা করেননি। সেইজন্য বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমরা সাহিত্য পেলেও সাহিত্যের ইতিহাস একেবারেই পাইনা।

প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয়দের আগমনের পরেই তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এদেশের বিদ্বানদের মধ্যে ইতিহাস-চেতনা প্রকটিত হয়। বিশেষ করে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াস এযুগেই সূচিত হয়। মধ্যযুগে মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস চেতনা ছিল তবে তা মূলত বংশাধিপত্যমূলক ইতিহাস-চেতনা, সামাজিক কিংবা সাহিত্যভিত্তিক ইতিহাস-



চেতনা নয়। এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস-চেতনা প্রসারিত হয়। *এশিয়াটিক রিসার্চ* নামের পত্রিকার অনুসন্ধানমূলক রচনাবলী এদেশের বিদ্বানদের পথ-প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপাত্ত সংগ্রহের প্রাথমিক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় জেমস লং-য়ের গ্রন্থপঞ্জীতে, ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে। পাদ্রী জেমস লং *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* নামের গ্রন্থতালিকায় ১৭৯৫ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত এই ষাট বছরে যে সব বাঙ্গালা গ্রন্থ ও পুস্তিকাদি প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা ও বিবরণী দিয়েছেন। শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টান মিশন প্রতিষ্ঠা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন, কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশের গ্রন্থজগতের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উনিশ শতকের সূচনা থেকে বঙ্গদেশে আধুনিক ছাপাখানা নির্ভর পাঠ-নির্মিতি সূচিত হয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে উপনীত করে। ১৮৭২ সালে বঙ্গদেশে প্রথম লোকগণনা অনুষ্ঠিত হয়ে বঙ্গদেশের জনমিতিক (demographic) বাস্তবতা উন্মোচন করে দেয়। জানা যায়, বঙ্গদেশের কোনো কোনো জেলায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* রচনা করে বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে জেমস লং-এর তালিকা প্রকাশ, ১৮৭২ সালে রামগতি ন্যায়রত্নের সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ দুটোই লক্ষ্যণীয় ঘটনা। জেমস লং-এর তালিকায় গ্রন্থের বিষয়ভিত্তিক বিভাজন আছে, মোট ১৪০০ গ্রন্থের তালিকায় তিনি "Musalman Bengali Literature" শিরোনামে ৪১টি গ্রন্থের নাম দিয়েছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত দিয়েছেন। মুসলমান সাহিত্যে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন- The Musalmans have always been noted for the tenacity with which they have clung to their own ideas and Language, and for the obstinacy with which they have resisted foreign influence. The Persian, their great prop, has been shorn of its honours in India, and the Musalmans are adverse to learn the vernaculars; hence, as the urdu has been formed by a mixture of Persian and Hindi, So the Musulmans have formed in Bengali a kind of lingua franca, a mixture of Bengali and urdu, called the boatman's Language. This must eventually give way to the overwhelming influence of the Bengali, but in the meantime, as illustrative of the phases of

mind of the people, is appended a list of the principal books in this dialect, printed at Musulman presses in Calcutta, which have a wide circulation, and particularly among boatmen and the Musulman population of Dacca. They are chiefly translations from the Persian or Urdu". (সেন, পৃ. ৪৬০), জেমস লং যে মুসলমানী গ্রন্থগুলোর উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল- *আবুসামা, আজাবুল কুবর, আমির হামজা, বাহার দানেশ, বেকুবমোলা, বেদারুল গাফেলিন, ভাবালাভ, সুআত, চাহার দরবেশ, গোলা বাকাউলি, হযরতের তোয়াল্লাদ, হাজার মসলা, হাতেম তাঈ, ইবলিশনামা, ইসলামগতি, ইমান ছুরি, জয়গুম, কাজী হয়রান, কুনজী বেহারী, কেয়ামত নামা, লালমন কেচ্ছা, মউলাদ আদম, মৌলাদ শরীফ, মকতল হাছেন, মেফতহুল জেনাত, মেয়রাজনামা, মুসে রাইবার, মুর্শীদনামা, নিজামুল ইসলাম, নুরুল ইমান, ওফাতনামা, রাদা মনকেরা, শাহনামা, সুরজু উজাল, সিফাত সেলাত, সাফায়েতুল মোমেনীন, সোনভান, তাজাহিজ তাকবিন, তমবিহাল জাহেলীন, তোতা ইতিহাস, তামবিহুল, গাফেলিন, ইউসুফ জুলেখা,* ইত্যাদি। জেমস লং-এর তালিকায় এসব গ্রন্থনাম থাকলেও রামগতি ন্যায়রত্নের সাহিত্যের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে কোনো বিবরণী নেই। মনে রাখা দরকার জেমস লং-এর তালিকার ১৭ বছর পর রামগতির ইতিহাস প্রথম ছাপা হয়। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত ইতিহাস নির্মাণের প্রথম বিবরণী উপস্থাপন করে রামগতি ন্যায়রত্ন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সমকালে প্রাপ্ত তথ্য ভিত্তি করে তিনি ইতিহাস লিখেছেন। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের আদ্যকালের ইতিহাস তখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের নামমাত্র পরিচয় বিবৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। মধ্যকাল শুরু হয়েছে চৈতন্যদেবের উৎপত্তি কাল থেকে, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের মধ্যকাল ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*, কবিকঙ্কণের *চন্ডীমঙ্গল*, রামপ্রসাদ আর কবিরঞ্জণের *বিদ্যাসুন্দর। চৈতন্য চরিতামৃত* স্থান লাভ করেছে, মনসাভাসানের পরিচয় আছে, রামেশ্বরের *শিবসংকীর্তণ* আছে। মধ্যকালের বাংলা সাহিত্যের পরিচয় এই টুকুন। তারপর উপস্থাপিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের 'ইদানীন্তনকাল'। ইদানীন্তনকাল সূচিত হয়েছে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* রচনা থেকে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ের *প্রবোধচন্দ্রিকা*, রামমোহন রায়ের রচনাবলী, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, দাশরথি রায়ের পাঁচালী। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং সামান্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-*দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী* ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনার সূচনার যুগে *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*



সমাপ্ত হয়। রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত ইতিহাসের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহিত্যকৃতির কোনো নিদর্শনপ্রাপ্তি কিংবা মূল্যায়নের হদিস পাওয়া যায় না। ১৮৭২ সালের রচিত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিম সাহিত্যকৃতির অস্তিত্ব অনাবিষ্কৃত থেকে গেল। দেখে মনে হয় বাংলা সাহিত্য যেন শুধু হিন্দুরচিত সাহিত্য সাধনা।

বাঙলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হল দীনেশ চন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে, আজকে থেকে ঠিক একশ বছর আগে। এই ইতিহাসে প্রথম বঙ্গদেশের বৌদ্ধ ও মুসলিম সাহিত্য-সাধনার যৎকিঞ্চিৎ স্বীকৃতি পাওয়া যায়। দীনেশ চন্দ্র সেন বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যুগকে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এতে *শূণ্যপুরাণ, নাথ গীতিকা, গোরক্ষবিজয়* ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি ধর্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে তত্ত্ব প্রদান করেছেন। যুগবিভাগ করতে গিয়ে তিনি একটি যুগকে বলেছেন গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্যপূর্ব সাহিত্য, পরের যুগকে বলেছেন শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ, অপর একটি যুগকে বলেছেন কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ। দীনেশ চন্দ্র সেন বঙ্গদেশে ইংরেজ আগমনের সংবাদ পরিবেশন করে তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সমাপ্তি টেনেছেন। উপসংহারে তিনি একটি চমকপ্রদ দাবী উত্থাপন করেছেন তা হল- 'উত্তর ও পূর্ববঙ্গই বঙ্গসাহিত্যের আদিতীর্থ'। এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যে সব তথ্য উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নরূপ: আমরা প্রাচীনতম *মহাভারত* পূর্ববঙ্গ থেকে পেয়েছি, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, রাজেন্দ্র দাস, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি অনুবাদকেরা ষোড়শ শতকে পূর্ববঙ্গে জন্মেছেন। কৃত্তিবাসের শিক্ষাদীক্ষা পূর্ববঙ্গে হয়েছিল, তাঁর গুরুর নিবাস ছিল পদ্মাপাড়ে, গঙ্গাদাস, ভবানীদাস, শিবচন্দ্রসেন, চন্দ্রাবতী এঁরা সব পূর্ববঙ্গ থেকে আলো বিকীরণ করেছেন। মনসা নামাঙ্কিত দেবীর সাহিত্যের প্রায় সবটাই পূর্ববঙ্গের নিজস্ব। তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বলেছেন- "আলোমন্ডলের কেন্দ্রবর্তী সূর্য, আলোর আদি খুঁজিতে গেলে যেরূপ পূর্বদিকেই মুখ ফিরাইতে হয়, বঙ্গসাহিত্যের আদি খুঁজিতে সেইরূপ পূর্ববঙ্গেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে" (পৃ. ৩৮৩)।

রামগতি ন্যায়রত্নের ইতিহাসে তথ্যের যে স্বল্পতা ছিল দীনেশ সেনের ইতিহাসে তার প্রাচুর্য দেখা গেল। দীনেশ চন্দ্র সেন *গোরক্ষ বিজয়* , আলাওলের *পদ্মাবতী* ও অন্যান্য মুসলিম কবি সাহিত্যিকের কৃতির পরিচয় তুলে দিয়ে বাঙলা সাহিত্য যে অবিমিশ্র হিন্দুর সাহিত্য নয়, এতে যে বৌদ্ধ ও মুসলিম সাহিত্যিকদের সাধনার পরিচয় আছে তা প্রতিষ্ঠিত করলেন। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, আগেই বলেছি ১৮৯৬

খ্রীস্টাব্দে, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে পরিশীলন, পরিমার্জন ও সংযোজন হয়েছিল। দীনেশ সেনে জীবৎকালে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত তিনি ভূমিকা লিখেছিলেন। ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসের ২০ তারিখ তিনি মারা যান, তার দুবছর পর সপ্তম সংস্করণ হয়। তার পর অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা লেখেন দীনেশ সেনের সুযোগ্যপুত্র বিনয় চন্দ্র সেন।

দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তথ্যবিন্যাস ও বিশ্লেষণ নৈপুন্যে অপূর্ব গ্রন্থ। সাহিত্যের ইতিহাস যে শুধুমাত্র তত্ত্ব ও তথ্যের আঁকাড়া উপস্থাপনা নয়, ইতিহাসের ও যে সাহিত্যমূল্য আছে তা এ গ্রন্থের পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন। রামগতি ন্যায়রত্নের ইতিহাসকে একমাত্রিক ইতিহাস হিসেবে অভিহিত করলে দীনেশ সেনের ইতিহাসকে একাধিকমাত্রিক ইতিহাস বলে উল্লেখ করা যায়। রামগতি ন্যায়রত্নের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে মনে হবে বাংলা সাহিত্য পশ্চিমবঙ্গের অবদান অধিক। সেকারণে দীনেশচন্দ্র সেন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ব বঙ্গের কৃতিকে মুখ্য করে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে ঘটির দেশ থেকে এনে বাঙালদেশে স্থাপনার চেষ্টা করেছেন তিনি।

দীনেশ চন্দ্র সেনের ইতিহাস লেখা যখন শেষ হয়, সেই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* এদেশে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার মুখপত্র বলে বিবেচিত হয়। এই পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের বহু অজানা কবির কৃতির পরিচয়, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণার সূত্রপাত এ পত্রিকাতেই প্রথম লক্ষ্যযোগ্য হয়। এ পত্রিকায় প্রাচীন পুথির পরিচয় সংগ্রহের আহ্বান জানানো হয়। প্রাচীন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার কাহিনী, বিবরণী, বিশ্লেষণ স্থান পেতে থাকে। এক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ নগেন্দ্র নাথ বসু এবং আরো অনেকে অবদান রাখেন। এইসব তথ্য উপাত্তের সঙ্গে যুক্ত হয় চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের ঘটনা। এই দুটো আবিষ্কারের তাৎপর্য দীনেশ সেনের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি, নতুন ইতিহাস লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লেখক সুকুমার সেন। তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে* বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসের সূত্রপাত-কাল সম্প্রসারিত করতে হয়। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় সংরক্ষণ করতে হলে কালের দিগন্ত সম্প্রসারিত করা ছাড়া উপায় ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বসন্তরঞ্জনরায় বিদদ্বল্লভ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধ বাগচীর গবেষণা এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙলা ভাষার



ইতিহাসকে ৬৫০ খ্রীস্টাব্দে সংস্থাপন করে ইতিহাসের সীমা বৃদ্ধি করে দিলেন। *চর্যাপদ* আবিষ্কার ও সম্পাদনা, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* আবিষ্কার ও সম্পাদনা এই দুটো বিষয় বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক অন্যান্য উপমহাদেশীয় সাহিত্যের তুলনায় কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত আভিজাত্য দান করে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ১৯৩৫ সালে মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রকাশ করেন *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য।* মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মধ্যে কবি আলাওল-এর *পদ্মাবতী* বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করেছিল, দীনেশ সেনের দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্যে। রোসাঙ্গ রাজদরবারের সাহিত্য সাধনার এই পরিচয় ছিল অভাবিতপূর্ব। দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, মরদন, শমশের আলী, মোহাম্মদ খান, দোনাগাজী চৌধুরী, আবদুল নবী, সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর, মোহাম্মদ রাজা, মোহাম্মদ রফীউদ্দীন, সেরবাজ আবদুল আলীম, রামজীদাস, সর্বশেষে আবদুল হাকীম বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করার যোগ্য বিবেচিত হল। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পূর্ববঙ্গে বিস্তার লাভ করলো তা নয়, এ ইতিহাস ছড়িয়ে পড়ল বর্হিবঙ্গে, রোসাঙ্গে আরাকানে। দেখা গেল ত্রিপুরাধিপতি ও রোসাঙ্গ রাজ্যাধিপতি চট্টগ্রাম নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ করলেও বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় কেউ কার্পণ্য করেনি। উনিশ শতকের সূচনায় উপকরণ বিরলতার কারণে বঙ্গসাহিত্যের যে ইতিহাস হতে পারে তাই ভাবা যায় নি, বিশ শতকের প্রথম ভাগ শেষ না হতেই সে ইতিহাসে তাৎপর্য যাচাই করে উপাত্ত সংযোজন করাই কঠিন কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস রচয়িতারা একজন অপরজনের অসম্পূর্ণতা দেখে বিস্মিত হতে থাকেন। মুসলিম সাহিত্য সাধনার অবমুল্যায়ন লক্ষ্য করে লিখিত হয় *মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ইসলামী বাংলা সাহিত্য* অবিভাজিত ইতিহাসের তত্ত্বসূত্রে চিড় ধরে। বাঙলার সাহিত্য সাধনার প্রকৃত পরিচয় উদঘাটনের জন্য দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪০-এর পাকিস্তান আন্দোলন মুসলিম স্বাতন্ত্র্য-চেতনাকে প্রকট করে তোলে। মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগের ইতিহাসে বাঙলার মুসলিম সাধনার পরিচয় নিয়ে গবেষণা হয়। এক্ষেত্রে কাজী আবদুল মান্নান, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান, মোহাম্মুদ মনিরুজ্জামান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। মুসলিম আইডেনটিটি বা মুসলিম স্বাতন্ত্র্য পরিচয় উদ্‌ঘাটনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে সৈয়দ আলী আহসান ও মুহম্মদ আবদুল হাই প্রণীত *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।* মূলত একটি যৌথ সারসংকলনমূলক ইতিহাস বিশ্লেষণ হলেও *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে* ইতিপূর্বে উপেক্ষিত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের সাধনাকে বিশেষভাবে প্রকটিত করা হয়। মুহম্মদ এনামুল হক মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণে যে পক্ষপাত সুনির্ধারণ করেছিলেন, সে ধারা রক্ষিত হয়েছে *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে*। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের

ইতিহাসগুলোতে যে একদেশদর্শী পক্ষপাত দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছিল, বিশ শতকে লেখা এ দুটো ইতিহাস গ্রন্থে তার ক্ষতিপূরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেওয়ার কারণে দুটো ইতিহাসকেই সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে, কেউ কেউ সরলীকরণ করে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগও এনেছেন। মূলতঃ *মুসলিম বাংলা সাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* একধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ। দুটো গ্রন্থই সাহিত্য সাধনার গুণগত মূল্যায়নের প্রশ্নটিকে মুখ্য বিবেচনার বিষয় হিসেবে বিদ্বানদের সম্মুখে উত্থাপিত করেছেন। সাহিত্যের মূল্যায়ন কি সংখ্যার মূল্যায়ন, না উৎকর্ষের মূল্যায়ন- এ প্রশ্ন অনুসন্ধান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুখময় মুখোপাধ্যায় ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তথ্যবিন্যাস ও তথ্য বিশ্লেষণে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আহমদ শরীফের 'বাঙ্গালা ও বাঙলা সাহিত্য' এই সমন্বয় প্রচেষ্ঠার পরিণত ফসল।

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ মূলত বৌদ্ধ মননের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে। সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ আলী আহসান এক্ষেত্রে আবিষ্কৃত তথ্যাবলী পুনর্বিন্যস্ত করে ইতিহাস পুর্নগঠনের চেষ্ঠা করছেন।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে এক সময়ে তথ্যের অপ্রতুলতা ছিল প্রধান অন্তরায়, এখন সে অন্তরায় বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে। তবে একথা এখনও বলার সময় আসেনি যে, সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগে রায় বিনোদের *পদ্মাপুরাণ* সম্পাদিত হয়েছে। মঙ্গোলিয়ার উলান বাতরে *চর্যাপদের* অনুবাদ ও পাণ্ডুলিপির পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। *চর্যাপদের* সাহিত্যিক ও পাঠ-গুরুত্ব (textual significance) বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাপান থেকে সম্প্রতি *চর্যাপদের* তথ্য পাওয়া গেছে। বাঙলা সাহিত্য বৌদ্ধ মননের সামগ্রিক পরিচয় মুল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

'বাঙলা সাহিত্য হিন্দু রচিত সাহিত্য'- এ *কুসংস্কার* দূরীভূত হয়েছে। পৃথিবীর প্রধান চারটি ঐতিহ্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টান জীবনবোধ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এই চতুরাঙ্গিক ঐতিহ্যকে সুসমন্বিত করে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখা পুনর্বিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা-উপধারা বিশ্লেষণে সাহিত্যমূল্য সামাজিকমূল্য ও ঐতিহাসিকমূল্য পরিচিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ধারার তুলনামূলক আলোচনার পরিসংখ্যানগত তাৎপর্যের সঙ্গে নান্দনিক তাৎপর্যকে সমন্বিত করা প্রয়োজন।



## অসম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী


১। Karl, O. Novak, M. Petracek, K, Smekal, O (1965) *Contributions to the Study of the rise and development of Modern literatures in Asia.* Vol I (Dissertationes Orientalis, Vol. 4) Prague.

২। রামগতি ন্যায়রত্ন (১২৯৪=১৮৭২) *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (২য়) চুঁচুড়া।

৩। দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৯৬) *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা ।

৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৩২৩) *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৫। মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৯৩৫) *আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* কলিকাতাঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৬। সুকুমার সেন (১৯৪০) *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলিকাতাঃ ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

৭। সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯৪) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ আদিপর্ব*; ঢাকাঃ শিল্পতরু প্রকাশনী।

# বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় সমস্যা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

বর্তমান সেমিনারে আলোচ্য বিষয়- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় সমস্যা।

বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, সমস্যা অবশ্যই রয়েছে এবং সেই হেতু সর্বমাত্রিকতায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অদ্যাবধি রচিত হয়নি। 'সর্বমাত্রিকতা' কথাটার ওপরে আমি গুরুত্ব আরোপ করছি। তবে বিগত অর্ধ শতাব্দী কালে বিচ্ছিন্ন প্রয়াস কিঞ্চিৎ পরিমাণে হয়েছে, আমরা খণ্ডিত কাজ কিছু কিছু পেয়েছি, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। একটা নজির টেনে বলি Boris Ford-এর সম্পাদনায় সাত ভলিউমে প্রকাশিত The Pelican Guide to English Literature ধরনের মডেলের উদ্যোগও যদি গ্রহণ করা যেত! আসলে মেনে নেওয়া ভাল যে, ঐ প্রকারের উদ্দিষ্ট অর্জনে আমাদের অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। কখনওবা আন্তরিকতা এবং শ্রম সত্ত্বেও অনুসন্ধিৎসার চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব বিরাজমান। ইতিহাস যে বিবরণমালা গ্রন্থনাতেই সমাপ্ত নয়, তা ছাড়িয়ে আরো অনেক কিছু, সেই বোধের অনুপস্থিতি। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা তাকেই বলেছেন ইতিহাসচেতনা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে এ ধরনের কথার অবতারণা পুনরায় করা যাবে।

উৎসুক পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, ঐ ইতিহাস রচনার কর্ম সাধন করতে গিয়ে গবেষক পণ্ডিতগণ বাস্তব ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। মূলে যা উপকরণ-সংগ্রহ তা থেকে রচয়িতার আপন মানস ভাবনা পর্যন্ত ব্যাপকতায় সমস্যা সমূহের বিস্তার। অপর দিকে আরো রয়েছে ইতিহাসের সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা রক্ষণের ক্ষেত্রে, উপাত্তসমূহ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে, ইতিহাসের যুক্তিনিষ্ঠতা অনুসরণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সবটা মিলিয়ে পূর্বোক্ত ঐ 'সর্বমাত্রিকতায়' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কর্মকাণ্ডে নানা ক্ষেত্রেই বেশ ফাঁক রয়ে গেছে এবং স্বভাবতই তখন ফাঁক পূরণের জন্যে অনুমানের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। জ্ঞাতসারে কিংবা অজানা থেকে জাত ধারণার মোড়কে অন্য অসম্পূর্ণতা আবৃত করবার প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এতদ্ব্যতীত, historiography যে একটা আবশ্যিক বিজ্ঞান শাস্ত্র এই বিষয়ে সাধারণতঃ আমরা চেতন নই। তবে এখন,



সম্প্রতি কালে ক্রমেই আমরা জানছি যে, সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ বিচ্ছিন্ন কোনো কর্মমাত্র নয়, সামগ্রিকতায় তা multi-discipline নির্ভর পূর্ণাবয়ব কর্মকাণ্ড, আন্তরভূমি পর্যন্ত তার প্রসার। অতএব, তদনুযায়ী যথাপ্রয়োজন উপকরণের সন্ধান- বাস্তব জীবনচর্চার আর মননচর্চার কোন্ ব্যাপক পটভূমিতে সাহিত্যশিল্পের সৃজন সেই সন্ধান এবং তথ্যসমর্থিত যুক্তিবিচারের, শৃঙ্খলা-পারম্পর্যের মাধ্যমে অতঃপর সাধিত হবে ঐ ইতিহাসের রচনা- এই মতো ধারণা করছি।

এক্ষেত্রে আমাদের কর্মীপুরুষদের সাধনা প্রয়াস সম্বন্ধে ঢালাও মন্তব্য অবশ্যই করব না। তা ধৃষ্টতার নামান্তর বলে বিবেচনা করি। প্রশংসনীয় অসাধারণ কৃতিত্ব তাঁদের। একেবারে বিরাণ ভূমিতে প্রচুর ফসল তাঁরা ফলিয়েছেন। লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসে তাঁরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, নিষ্ঠাবান, এবং নিশ্চয় বলতে হবে যে, তুলনারহিত তাঁদের অধ্যবসায়; অগ্রপথিকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মফঃস্বল কুমিল্লার শিক্ষাজীবী দীনেশচন্দ্র সেন এবং আরেক মফঃস্বল চট্টগ্রামের কেরানী-পেশাজীবি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। সড়ক ধরে যাঁরা এলেন তাঁদের কল্যাণে হাজার-দেড় হাজার বছরের কাল ব্যবধানে রচিত বাংলা সাহিত্যের সন্ধান আমরা জেনেছি; স্থান ব্যবধানে তার পরিক্রমণ বঙ্গোপসাগর তটবর্তী বর্মী আরাকান অবধি প্রসারিত। আমাদের অহঙ্কার এই বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার আমাদের। এইখানে তুলনা করব বিশ্বের সমৃদ্ধতম ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাস কতো কালের? যদি Beowulf থেকে সূচনার হিসেব ধরা যায় তবে তা অষ্টম শতাব্দী থেকে, আর যদি Chaucer-এর Canterbury Tales থেকে তবে সে ইতিহাস চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। তেমনি ফরাসী সাহিত্যের আদিযুগের সূত্রপাত একাদশ দ্বাদশ শতকের 'Songs of deeds' নামের দীর্ঘ মহাকাব্যধর্মী কবিতামালা থেকে। এই কালপূর্বে বাংলা সাহিত্যের উত্তরণ ঘটেছে চর্যাপদ পেরিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যে। খেয়ালে রাখতে হবে ১৯১৩তে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি অবধি বিশ্বমানচিত্রে বাংলা কিন্তু একটি অতি-আঞ্চলিক ভাষা মাত্র, এবং ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরই প্রথম বাংলার আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জন। সেই ভাষার সাহিত্যের কৌলীন্য হাজার দেড় হাজার বছরের, এবং পূর্বোক্ত ইংরিজি-ফরাসী সাহিত্যের প্রাচীনত্বের সাথে অবস্থানটা বুঝে নেব। আমাদের অহংকার এই ক্ষেত্রে।

যাইহোক। এখন ইতিহাস এবং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমস্যার প্রসঙ্গকথায় ফিরে আসি।

এইখানে প্রথম জিজ্ঞাসা আসবে – সুনির্দিষ্ট কত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস? লক্ষণীয় জবাব যে, নিশ্চিত করেই উদ্ভব কালাবধি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতার ডকুমেন্টেশন

তেমন নেই। ইতিহাসবিদ, ভাষাবিদ, লিপিবিশারদ, সাহিত্য গবেষক এঁদেরকে আপন আপন সন্ধান ও সামর্থ মোতাবেক নির্মাণ করে নিতে হয়েছে। আমরা ভিত্ নির্ভর কাঠামো দাঁড় করানোর কথা বলছি। তা সমন্বিত কর্মকাণ্ডের ফসল এমন উক্তি করা যায় না। কেননা প্রয়াস সমূহ বিচ্ছিন্ন নানান দৃষ্টিভঙ্গীর এবং ক্ষেত্রবিশেষে নানান তাগিদজাত। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যার গোড়ায় কাজ করেছে এই প্রকারের সীমাবদ্ধতা। অপরাপর সমস্যাসমূহের কথায় পরে আসছি।

জিজ্ঞাসা ছিল বাংলা সাহিত্যের *প্রাচীনত্ব* নিয়ে। এই *প্রাচীনত্ব* ইতিহাস প্রসঙ্গে এতাবৎকাল পণ্ডিতমহলের সিদ্ধান্ত যে হাজার থেকে দেড় হাজার বছরের। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে বাংলা সাহিত্য রচনার প্রাচীনতম সাক্ষ্য পাওয়া যায় অষ্টম শতাব্দীতে 'খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে আমরা কানুপার সময় ফেলতে পারি।' অপর পক্ষে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ বাগচী জানাচ্ছেন-যাত্রাগুরুর কাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পড়ে। ডঃ সুকুমার সেন এবং তাঁর সমমনা পণ্ডিতগণ এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পরিপোষক। ইতিহাসের প্রথম পর্বের কালসীমা সাধারণভাবে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত নির্দেশিত করা হয়েছে।

অতঃপর কতো বিচিত্র পথে, পতন বন্ধুর অভ্যুদয়ের ভেতর দিয়ে বাংলা সাহিত্য সৃজনের ধারা এগিয়ে গেছে। কখনো প্রবল, কখনো মন্থর ক্ষীণ। নানান শাখা-উপশাখায় বিভক্ত বিষয় নির্ভর, বিশ্বাস নির্ভর, পরিবেশ নির্ভর, আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান নির্ভর, পৃষ্টপোষকতা নির্ভর। এটাই ইতিহাস, এগিয়ে চলাটাই ইতিহাস। আদিযুগে সেই আলো আঁধার সন্ধা ভাষায় জনাকতক সিদ্ধাচার্যের রচনা থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আজ বিশ শতাব্দীর শেষ প্রহরে উত্তরিত। বলতে পারি সাগর সঙ্গমে এসে মিশেছে। এটা কি অত্যুক্তির মতো শোনাবে যে, বাংলা সাহিত্য ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ভুবনের অঙ্গনে কোনো এক প্রান্তে হলেও আপন আসনটি করে নিয়েছে?

প্রসঙ্গতঃ এখন আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে সন্ধান নেব। সমস্যা। কেননা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অবগত যে, সমস্যা যা বলা হচ্ছে, নানা প্রকারে তা সম্পর্কিত ঐ রচনা-কর্মকাণ্ডের সাথেই। অতএব ইতিহাস সন্ধানের কথা। বাংলা সাহিত্যের বয়েস দীর্ঘ কালের, তবে তদ্‌সত্ত্বেও দুঃখজনক যে সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকর্মের উদ্যোগ গ্রহণ তেমন নয়, স্বল্পোর্ধ্ব শতবর্ষের। যেমন নয় সুপ্রাচীন এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের এবং ভূখণ্ডবাসী মানুষের ইতিহাস রচনার প্রয়াস।



যাইহোক, উল্লেখ্য ক্ষেত্রে প্রথম জরুরি কাজটি করেন রামগতি ন্যায়রত্ন। তাঁর গ্রন্থ 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রকাশকাল ১৮৭২। অতঃপর প্রকৃতার্থেই ইতিহাস রচনার মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত দীনেশচন্দ্র সেনের *'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'* প্রকাশিত হয় ১৮৯৬-তে। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে, 'প্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত।' তবে বারংবার আমাদের আক্ষেপের উচ্চারণ যে; আমাদের ভাষায় রচিত হাজার দেড় হাজার বছরের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কিত তাৎপর্যবাহী, আবশ্যিক উপকরণ-উপাদান সমূহ উদ্ধারের কর্মে এবং বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিবিচারনির্ভর 'যথার্থ' ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে উৎসাহী, সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণের সাক্ষাৎ তেমন পাওয়া যায় না। তবু, রামগতি ন্যায়রত্নের কাল থেকে ইতিমধ্যে শতবর্ষ-প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে এল, এই ক্ষেত্রে কাজ কতটা হয়েছে, মোটামুটি একটা ধারণা পেতে চাই গবেষকদের কাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ মোটামুটি দু'টো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ ১. প্রাচীন কালাবধি সামগ্রিকতার আদলে ইতিহাস রচনার প্রয়াস, ২. নানাবিধ প্রয়োজনের এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মানসভাবনার তাগিদে খণ্ড/ বিচ্ছিন্ন রচনার প্রয়াস। প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন কয়েকটি নির্বাচিত ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ করা যাচ্ছে। বলা দরকার যে, তালিকাটি অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ নয়।

১. রামগতি ন্যায়রত্ন, *'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিষয়ক প্রস্তাব* (১ম ভাগ); প্রকাশ কাল ১৮৭২';

২. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬;

৩. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (৪ খণ্ড), ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৯৪০,

৪. গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা* (২ খণ্ড), ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪;

৫. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (৬ খণ্ড), ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯;

৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯;

৭. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮;

৮. আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৯৮৭।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে বিশেষ বিশেষ যুগভিত্তিক ও নানবিধ বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস এবং ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ সমূহ। পুনরায় জানাই, এই তালিকাটিও অসম্পূর্ণ। তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য যাতে করে কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক ধারণা পাওয়া যায়।

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (২ খন্ডে প্রাচীন যুগ ও মধ্য যুগ) ১ম খন্ডের প্রকাশ ১৯৫৩;

২. সুশীলকুমার দে, *Bengali Literature in the Nineteenth Century'*, প্রকাশ ১৯১৯;

৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬;

৪. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক, *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫;

৫. সজনীকান্ত দাস, *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬;

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ ১৯৫০;

৭. সুকুমার সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬;

৮. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭;

৯. কাজী আবদুল মান্নান, *'The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal'*, প্রকাশ ১৯৬৫;

১০. হুমায়ূন কবির, *বাংলার কাব্য*, প্রথম প্রকাশ ১৯৪২;

১১. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্য যুগ*, ১৯৫২;

১২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ১৯৬৪।

বক্ষমান আলোচনায় আমরা এতাবৎকাল রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মুল্যায়নের প্রয়াস পাব না। মূল প্রস্তাব সেই মর্মে নয়। আলোচনারম্ভেই নিবেদন করা হয়েছে যে, উদ্দেশ্য ইতিহাস রচনায় সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ। ইতিপূর্বে আমরা ডকুমেন্টশনের ক্ষেত্রে দুর্বলতার কথা, ফাঁকের (gaps) কথা বলেছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে কী ধরনের সঙ্কটের মুকাবিলা করতে হয়, প্রসঙ্গতঃ



ইতিহাসকর্মীর একটি স্বীকারোক্তি এখানে উদ্ধৃত করি 'ইতিহাসের উপকরণ যৎসামান্য এখন পর্যন্ত ইতিহাস বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই প্রমাণসাপেক্ষে দলিলের ভিত্তিতে গঠিত নয়; ... আসলে ইতিহাস বস্তুটা আমাদের ধাতস্থ নয়। যাহাদের জাতীয় ইতিহাস পুরাণ কাহিনীতে পর্যবসিত, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস না থাকিবারই কথা।' (সজনীকান্ত দাস, *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস*, ১৯৭৫, পৃ. ২)। বড়ই খোলাখুলি এই স্বীকারোক্তি। নেতিবাচকও বটে। তবে অভিজ্ঞতায় বলে নেহায়েৎ অসত্য নয়। পথিকৃৎ যাঁরা তাঁদেরকে আরম্ভ করতে হয়েছিল এই রকমেরই প্রায় শূন্য অবস্থান থেকে। দীনেশচন্দ্র সেন ত' বলেইছিলেন, 'এখনও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানি পূর্নাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সময় হয় নাই' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। কেন হয় নাই, অবশ্য সেই সব প্রতিবন্ধকতার কথা তাঁর জানা ছিল। এবং তিনিই প্রথম চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন আসল সমস্যাসমূহ কী, কী, সেগুলির অবস্থান কোথায়? ড. সেনের মহৎ কৃতিত্ব তিনি প্রচুর প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপকরণের সন্ধান আবিস্কার করেছেন, এবং তৎসহ ইতিহাস-নির্মাণের লক্ষ্যে সুশৃঙ্খল পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। তবে বিস্মৃত হব না যে, তাঁর ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্যোগ। পরবর্তী কালে অবশ্য তথ্য-উদ্ধারের কর্ম অনেক অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসকে উপস্থাপনার বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এই কর্মে প্রায়শঃ জিজ্ঞাসার অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

যাই হোক, ড. দীনেশচন্দ্র সেনের কৃতীকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কর্মকান্ডে যদি প্রথম মাইলস্টোন বলে আখ্যায়িত করি, তবে বছর গননায় দেখব সার্ধ চার দশকের কাল ব্যবধানে দ্বিতীয়টি প্রোথিত করেছিলেন ড. সুকুমার সেন। তাঁর, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য-'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়িনি।' তৎসহ লক্ষ্য করতে হবে বিশেষ এই কথাটি 'এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্যবৃদ্ধি করেছে।' আসলে অতীব গুরুত্ববাহী এক মস্ত সমস্যা ত' এখানে–রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পটভূমিতে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা।

দীর্ঘকালাবধি কেমন প্যাটার্নমতো যেন, দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ঃ আদি যুগ, আদি-মধ্যযুগ, মধ্যযুগ, উত্তর-মধ্যযুগ, ক্রান্তিযুগ, আধুনিক যুগ ইত্যাদি। এই প্রকারের যুগ নির্ভর ইতিহাস-রচনার ধারা। কিম্বা, শতাব্দী-ওয়ারী হিসাব। আরো রয়েছে, রাজা-বাদশাহ-শাসকনির্ভর বিভাজন–নির্দেশনার মাধ্যমে সাহিত্যকর্মের পরিচিতি উদ্ধার, ধারাবাহিকতার বিবরণ দাবী-যেমন পালযুগ, সেন যুগ, তুর্কী আমল, পাঠান আমল, মোগল আমল, ইংরেজ আধিপত্য-শাসনের কাল। এতদ্ব্যতীত ইতিকথা/ ইতিবৃত্ত আখ্যায়

চিহ্নিত এমন সব রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেগুলি প্রধানতঃ গ্রন্থকার-গ্রন্থনাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ descriptive catalogue-তুল্য। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার অঙ্গনে মোটামুটিভাবে উক্ত দুই প্রকারেরই মুখ্য প্রবণতা। তাতে করে হয়তবা হিশেবের সুবিধে হতে পারে, তবে সাহিত্য-সৃজনের ন্যায়, (যা একই সাথে সুকুমার ও মননশিল্প) কর্মকান্ডের রূপান্তর, উত্তরণ, বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ইত্যাদি যথার্থ করেই চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। সেইখানে অবিচ্ছেদ্য রয়েছে দেশের কথা, দেশের ভূগোল-প্রকৃতি-পরিবেশের পটভূমি, কালে কালান্তরে মানুষের লালন, মানুষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় জীবন ও নানান সম্পর্কের বিচিত্র টানাপোড়েন। তাই থেকেই ত' অপরাপর শিল্পকলার ন্যায় সাহিত্যেরও উদ্ভব-বিকাশ, এবং বিশেষ বিশেষ চরিত্ররূপ অর্জন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই কথাগুলি আমরা বুঝে নিতে চাই। 'বাঙলার কাব্যধারা' প্রসঙ্গে আলোচনায় হুমায়ুন কবির সমস্যাটিকে স্পষ্টত চিহ্নিত করছেন এভাবে, 'সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার কাব্যধারার বিস্ময়কর বিকাশের পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়ার দিন আজো বোধ হয় আসেনি। তার জন্য ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক যে তথ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাও আজ পর্য্যন্ত অসমাপ্ত। সে বিষয়ে অভাববোধও বেশী দিনের কথা নয়। অথচ সেই পশ্চাদপটের অভাবে বাঙলার কাব্যে বাঙালীর মানসের বিকাশ বোঝা যায় না, কারণ ব্যক্তির মধ্যে সমাজমনের প্রকাশেই কাব্যের জন্ম।'- (*বাঙলার কাব্য*, ১৯৪২, ভূমিকা)। আর গোপাল হালদার জোর দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরনের ওপর। বিশদ করে তিনি বলেছেন, 'জাতির জীবন থেকে তার সাহিত্যে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। ... জীবনযাত্রার গোড়ার কথা আগে জানতে হয়, তবেই বোঝা সম্ভব সাহিত্যে তার প্রতিফলন কতটা পড়েছে প্রত্যক্ষ, কতটা পরোক্ষ।' স্বভাবতই যখন ইতিহাস রচনায় সমস্যার কথা, তখন উপরি বর্ণিত জিজ্ঞাসাসমূহ এসে যায়।

বিবেচনা করি যে, পূর্ববর্তী আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা বিষয়ক কতিপয় মূল সমস্যার চেহারা লক্ষ্য করা গেছে। তবে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-জটিলতার এখানেই শেষ নয়। আলোচনার উপসংহার অংশে উপনীত হয়ে এখন আরো কতিপয় বিশেষ অনুসন্ধিৎসা উত্থাপিত করতে চাই। নিবেদন যে, সবটা মিলিয়ে নিম্নবর্ণিত রূপে একটি তালিকা সাজিয়ে নেওয়া যায়ঃ

ক. পন্ডিতেরা আবিস্কার করেছেন হাজার বছরের পুরাণ বাংলায় রচিত সাহিত্যের নিদর্শন। সাধারণভাবে তা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পরিচিতিতে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। প্রশ্ন কতটা যথার্থ এই প্রকারের সরলীকৃত পরিচিতি? সম্বল বলতে এতাবৎকাল উদ্ধারকৃত



সাড়ে ছয়–চল্লিশটি পদ, কানুপা, ভুসুকুপা, ল্যুইপা, গুন্তরী, ঢেনঢন,, বিরুআ প্রমুখ করাঙ্গুলিরেখা গণনায় মাত্র কয়েকজন পদকর্তার ভণিতা, আর জনপদের প্রত্যন্তবাসী, নিম্নবর্গের একটি রুদ্ধ জনগোষ্ঠীর closed society র ভাষা–জীবনাচরণ–ক্ষুদ্র ভাবনা–খন্ড, পরিবেশ–এই অতি সীমিত উপকরণ প্রমাণের উপরে নির্ভর করে নির্মিত ইতিহাস চিত্র কতটা সামগ্রিকতার প্রতিধ্বনি করতে পারে? এবং সামগ্রিকতার বিবেচনায় কতটা তা গ্রাহ্য?

খ. চতুর্দশ শতাব্দীতে *শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন* কাব্যরচনার পূর্ববর্তী কালটিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বর্ণিত করা হয়েছে অন্ধকার যুগ বলে। কারণ সাহিত্যকর্মের নিদর্শন তেমন পাওয়া যায়নি। তাই থেকে প্রচারের ঢালাও মন্তব্য। কিন্তু আমাদের বলবার যে, সাহিত্যশিল্পের সৃজন এমন এক কর্ম তা থেমে থাকে না। দেশে প্রতিকূল পরিস্থিতি কখনো না কখনো অবশ্যই বিরাজমান থাকতে পারে; তবে ঐ প্রকারের সৃজনকর্মের ধারাবাহিকতা নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন হয় না, নেপথ্যে অন্তরালে কোথাও তা বহমান থাকে। অন্যবিধ কারণে তা' লুপ্ত হয়ে যেতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে; আমাদের পক্ষে এতাবৎকাল উদ্ধার করা সামর্থে কুলোয়নি। তাই বলে অমন করে সরাসরি নির্দিষ্টকরণ 'বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ' আখ্যায় দৃঢ় তথ্যভিত্তির অভাবে এবং যুক্তির বিচারে তা কতটা ধোপে টেকে সেই দ্বিধা কিন্তু থেকেই যায়।

অপর পক্ষে, বিপরীত বক্তব্যও রয়েছে। সেই মতের পোষকতা যাঁরা করেন তাঁদের দাবির সমর্থনেও তেমনি প্রামাণ্য উপকরণের উপস্থাপনা মোটে নেই।

গ. আদি–মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম উজ্জ্বল পর্ব 'ব্রজবুলি ভাষা'য় পদাবলী রচনার ধারা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় ব্রজবুলি নামে কি আদৌ কোনো জন-ভাষার অস্তিত্ব ছিল? কিংবা এটি প্রেমের রসসমৃদ্ধ কবিতা রচনার জন্যে একটি কৃত্রিম ভাষা কাঠামোর উদ্ভাবন? তাই যদি হয়, তবে কেন? বস্তুনিষ্ঠ হেতু কী?

ঘ. বাংলা সাহিত্যের পাঠক অবগত যে, ১. সারা মধ্যযুগ জুড়ে মঙ্গলকাব্য রচনার বান ডেকেছিল, ২. বৈষ্ণব পদরচনার এমন বিস্তার ঘটেছিল যে 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদ্যা ভেসে যায়', ৩. সংস্কৃত-ফার্সি-হিন্দী উৎস থেকে অনুবাদমূলক কাহিনী কাব্যরচনার অমন আগ্রহ উদ্যোগ, ৪. বিশেষ অঞ্চলে দোভাষী পুঁথিরচনা তৎসহ বিশেষ এক সময়ে মর্সিয়া কাব্যরচনার ব্যাপক প্রসার এবং ৫. প্রায় সমকালে ও পরবর্তী কালে বিদ্যাসুন্দর পালা রচনা, যাত্রা–পাঁচালী–কবিগান বেশ চওড়া ধারার সৃষ্টি করেছিল। পুনরায় সঙ্গত জিজ্ঞাসা-

কেন? এই প্রকারের প্রশ্নের বাস্তব পটভূমি সমর্থিত যুক্তিনির্ভর, বিশ্লেষণধর্মী জবাব থাকতে হবে। কেননা আমাদের জানা রয়েছে, সাহিত্য–শিল্পকর্ম গজদন্তমিনারে (ivory tower) আবাস নিয়ে স্বপ্নদর্শনের বিলাস নয়, বিচ্ছিন্ন কোনো আকস্মিকতায় এর জন্ম নয়। এর পেছনে social reality এবং তজ্জাত কার্যকারণ অবশ্যই বিরাজমান। সর্বশেষ জিজ্ঞাসা–আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে গদ্যরচনা, নাটক, মহাকাব্য, গীতিকবিতা, প্রবন্ধ, সাময়িকপত্র ইত্যাদি নানা বিচিত্র ও অভিনব আঙ্গিকনির্ভর এবং অবশ্যই নবীন জীবনচেতনা বিষয়নির্ভর সৃষ্টি আধুনিক সাহিত্য। কী বোঝায় আধুনিকত্বের ব্যঞ্জনায়? একই সাথে লক্ষ্য করতে হবে সাহিত্যসৃজনের এখন নতুন রাজধানী–সেটি ট্রেডিং এর কেন্দ্র, প্রশাসনব্যবস্থার কেন্দ্র, এলিট শ্রেণীর house, মেট্রোপলিটন সিটি–কলকাতা। অপরপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি দীর্ঘকাল প্রধানতই সাহিত্যকর্মের অঙ্গন ছিল কৃষি নির্ভর নদীমাতৃক দেশ বাংলায়। ব্যতিক্রম কেবল বাইরের মিথিলা আর রোসাঙ্গ রাজসভা, দেশের ভেতরে নদীয়া, কৃষ্ণনগর রাজসভা। এ পটভূমিতে এবং লালনে এই মৌলিক স্থানান্তরের বিষয়টিকেও গভীর বিবেচনায় আনতে হবে যখন বলি আধুনিক সাহিত্য। এটা সন-তারিখের অঙ্ক দিয়ে চিহ্নিত ব্যাপার কিংবা বিভাজন নয় মোটে।

এই সব প্রশ্ন আর এই সব সমস্যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কর্মকান্ডকে ঘিরে। আমরা জবাবের সন্ধান করব, সমাধান কোন পথে সেই সন্ধান। পথের দিশা দেবেন, আমাদের বিশ্বাস মোতাবেক সমাজবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুসারী পন্ডিত-গবেষকগণ। ইতিহাস রচনায় যে traditional ধারা অবলম্বন–মনে করি যে, প্রাসঙ্গিক সমস্যাসমূহের বীজ ঐখানে নিহিত।

# প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা চিহ্নিত করার পূর্বে এর নিদর্শণ সমূহের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শনগুলি হচ্ছে ঃ

(১) চর্যাপদ বা চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় (৫০ টি গান)

(২) চর্যাপদের টাকায় উদ্বৃত মীননাথের একটি শ্লোক

'কহন্তি, গুরু পরমার্থের বাট
কর্মকুরঙ্গ, সমাধিক পাঠ-
কমল বিকসল কহিহ ন জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা।'

চর্যাপদ ব্যতীত বাংলা ভাষার আরও কিছু নিদর্শণ আছে,

(১) প্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে প্রাপ্ত কিছু জায়গার নাম- ভূমিদান পত্রে-উল্লিখিত কয়েকটি গ্রামের নাম।

(২) বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দের *অমরকোষের* টীকায় প্রাপ্ত প্রায় তিনচার শ' শব্দ- একটি সংস্কৃত-চৈনিক অভিধানে প্রাপ্ত কয়েকটি শব্দ। [রচনাকাল-১১৫৯ খ্রীঃ]

(৩) বৌদ্ধ কবি ধর্মদাশের *বিদগ্ধ মুখমন্ডন* গ্রন্থে কয়েকটি কবিতা ছত্র।

(৪) *সেক শুভোদয়ায়* সংকলিত কয়েকটি গান ও ছড়া।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করেন চর্যাপদগুলি। সেগুলি তিনি প্রকাশ করেন ১৯০৭ সালে। এগুলি প্রকাশিত হবার পর বিতর্ক উঠেছিল চর্যাপদের ভাষা আদৌ বাংলা কিনা? হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্যের পর আরম্ভ- হলো পন্ডিতদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক মত বিরোধ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যারা রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন এবং পরবর্তীকালে আরও অনেকেই প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। - এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবোধ বাগচী-গোপাল হালদার, তমোনাশ দাশ গুপ্ত, মুহম্মদ এনামুল হক। বাংলার বাইরের পন্ডিতদের মধ্যে ছিলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

ইতিহাস প্রণেতাদের সামনে তখন দুটি সমস্যাই প্রধান ছিল।

১। চর্যাপদের ভাষা বাংলা কিনা, তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করা বা নিশ্চিত হওয়া;

২। চর্যাপদের সঠিক কাল নির্ণয় করা।

'সেক ও শুভোদয়া' ছাড়া ঐ কালের অন্যান্য নিদর্শনগুলি সম্পর্কে ঐ একই কথা।

চর্যাপদের ভাষা বাংলা নয় হিন্দী এ বিতর্কের সূত্রপাত করেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ বিতর্কের জবাব দিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন। তাঁরা আলোচনা করেছেন বাংলাভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে। বলা বাহুল্য শুধু মাত্র শব্দ সাদৃশ্য দ্বারা কোন ভাষার পরিচয় স্থির নির্ণয় করা যায় না ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যই সেখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া কর্তব্য। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন সেগুলি এরূপ। একটি কথা মনে রাখতে হবে সেযুগে প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে (বা বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপের মধ্যে) বহু সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। তা সে ভাষা গৌড়ী প্রাকৃত হোক কিংবা মাগধী প্রাকৃত হোক বা অন্তবর্তী স্তরের অপভ্রংশই হোক।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ব্যাকরণের যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এ কয়টি-

(১) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হিসাবে র/এর ব্যবহৃত হয়েছে। যা কোন পূর্ব মাগধী ভাষায় দৃষ্ট হয় না। হিন্দি উড়িয়া ভাষায় এ বিভক্তি নেই।

(২) অতীতকালের বিভক্তি হচ্ছে-ইল/ ইলে/ ইলাম।

(৩) ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হচ্ছে- ইব/ ইবে।

বলা বাহুল্য শেষোক্ত বিভক্তি গুলোও হিন্দী ভাষায় দেখা যায় না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। (দ্রষ্টব্য *ODBL*-1926, p. 112)

ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতাদের সমস্যা ছিল চর্যাপদ বা অন্যান্য ভাষা নিদর্শনের কাল নির্ণয়।



কাল নির্ণয়ের পূর্বে তৎকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবশ্যই প্রয়োজন।

গুপ্ত সামাজ্যকালে (৩০০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ) সমগ্র বাংলা এক কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভূক্ত ছিল এমন কথা প্রায় সকল ঐতিহাসিক অনুমান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। (নীহার রঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ: ৩৫৯) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর আর কিন্তু বাংলায় কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই পরিচালিত হতো। ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ গুপ্তরাজাদের অধীন ছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর, প্রথমেই গৌড় (তথা উত্তরবঙ্গ) স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। গৌড় অধিপতি হিসাবে শশাঙ্কের আবির্ভাব হয়। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল (৬০৭-৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত শশাঙ্ক গৌড় অধিপতি ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের সমতট রাজ্য খড়্গ বংশের রাজারা (আনুমানিক ৬৫০-৭০০ খ্রীস্টাব্দে) শাসন করেছিলেন। হুগলী নদী ও পার্বত্য ত্রিপুরা মধ্যবাঙ্গালার বদ্বীপ অঞ্চল এ রাজ্যভুক্ত ছিল। খড়্গ বংশের শাসনকর্তাদের প্রথম খড়্গোদ্যম তারপর জাত খড়্গ, দেব খড়্গ, রাজবাজ, রাজতট। (দ্রষ্টব্য H.C. Roy. *The Dynastic History of Northen India*)

তারপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উত্তরবঙ্গের পালবংশের রাজত্বকাল। এরা সুদীর্ঘ চারশত বৎসর বাংলা শাসন করেছিলেন। এদের সময়কাল ৭৫০ থেকে ১১৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা দৈত্যবিষ্ণু, তারপর ব্যাপাত; তারপরই গোপাল ও প্রথম গোপালের আবির্ভাবে পর থেকেই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিপত্তি। দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে ছিলেন চন্দ্র বংশের শাসকগণ। পূর্ণচন্দ্র-সুবর্ণচন্দ্র এঁরা ছিলেন শাসক-৯৫০ থেকে ১০৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত এদের শাসন কাল। রাঢ় অঞ্চলে শূরবংশ রাজত্ব করেন- ৯৫০ থেকে ১১০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। পূর্ব বঙ্গের বিক্রমপুরে ছিল বর্মণ বংশ। এদের শাসন সময় হচ্ছে ১০৫০ থেকে১১৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গে সেন বংশের অভ্যুত্থান। ১০৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত -এ বংশের শাসকদের অস্তিত্ব থাকলেও এদের আধিপত্য বা ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছিল ১২০১ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজির আগমনের বা আক্রমণের পর পরই।

ইতিহাসে এ রকম বিবরণ দৃষ্ট হয় যে পালদের আধিপত্য শেষ হয়ে গেলে বাংলায় সেন তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হতে থাকে। ব্রাহ্মন্য ধর্মের আগ্রাসনে বা ভয়ে কিংবা অত্যাচারে পাল আমলের বৌদ্ধ সহজিয়া তথা সিদ্ধাচার্যরা পার্শ্ববর্তী দেশ

তিব্বত নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যায় তাদের জ্ঞান সাধানার ফসল। বস্তুতঃ গৌড় অধিপতি শশাঙ্কের আমলেই (সপ্তম শতাব্দী) বৌদ্ধ বিদ্বেষের সূচনা তথা লক্ষণ দৃষ্ট হয়। হিউএন সাঙের বিবরণেও একথার প্রমাণ আছে। (নীহার রঞ্জন রায় বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৩৭৪-৭৫) পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মবিলম্বী ছিলেন- যদিও এদেরকে ক্ষত্রিয়জাত বলা হয়েছে। (নীহার রঞ্জন রায়, পৃ. ৪০১) অতএব দেখা যাচ্ছে- বৌদ্ধা ধর্মাশ্রিত যা কিছু রচনা সবাই রক্ষিত হলো নেপালে তিব্বতে। সুতরাং সেইসব সাহিত্য নিদর্শনগুলির তিব্বতী অনুবাদ হওয়া এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। সংস্কৃতে টীকা বা অনুবাদ হওয়াও তেমনি স্বাভাবিক ব্যাপারই। এতে একথাও সুস্পষ্ট যে সেকালে উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই ছিল সংস্কৃত ভাষার অধিপত্য।

চর্যাপদ সমূহের রচয়িতার কাল নির্ণয় করতে গিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অভিমত প্রকাশ করেন যে মীননাথ বঙ্গের আদি কবি। (দ্রষ্টব্যঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা*, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭) চর্যার টীকায় মীননাথের একটি পদ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মীননাথের নামান্তর মীনপাদ, মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছিন্দ্রনাথ, মৎস্যেন্দ্রপাদ বা মচ্ছেন্দ্রপাদ। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রণীত কৌলজ্ঞাননির্ণয় গ্রন্থে তাকে চন্দ্রদ্বীপ বিনির্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের একজন ধীবর। চন্দ্রদ্বীপ বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলারই প্রাচীন নাম। নাথ পন্থীদের আদি প্রচারক হলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। অবশ্য নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন মীননাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। ত্যাঙ্গুর গ্রন্থের বরাত দিয়ে তিনি এই উক্তি করেছেন (*বাঙ্গালীর ইতিহাস*, পৃ. ৫০১) ত্যাঙ্গুরে জালন্ধরী পাদকে বলা হয়েছে আদি নাথ। "কৌলজ্ঞাননির্ণয়" পুথির লিপিকাল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে ১০৫০ খ্রীস্টাব্দ এর রচনাকাল। অভিনবগুপ্ত 'মচ্ছন্দ্র বিভু' নামে মৎস্যেন্দ্র নাথের নাম উল্লেখ করেছেন। অভিনব গুপ্তের সময়কাল আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টাব্দ। কাজেই মৎস্যেন্দ্রনাথ তার বহু আগের লোক। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন- সিলভাঁ লেভীর *Le Nepal* গ্রন্থে পাওয়া যায় ৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালে এসেছিলেন। কাজেই মৎস্যেন্দ্রনাথ সপ্তম শতাব্দীর লোক।

পরবর্তীসময়ের গবেষক তমোনাশ দাশগুপ্ত এর মতে চর্যাপদগুলি আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর রচনা। সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়ের মতকে প্রাধান্য দিলেও তিনি বলেছেন চর্যাপদের রচনার সূত্রপাত অষ্টম শতাব্দী। (দ্রঃ তমোনাশ দাশ গুপ্ত-*প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*- পৃঃ ৪৬) যা হোক- এ প্রসঙ্গে সরোহবজ্রের দোহাকোষগুলির-উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি প্রাচীন বাঙ্গালাভাষার কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে সরোহবজ্র অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান



ছিলেন। প্রাকৃত ও প্রাচীন বাংলার মধ্যবর্তী অপভ্রংশ ভাষায় (পূর্বী অপভ্রংশ) এগুলি রচিত।

সরোহবজ্রের দোহার দুটি চরণ উল্লেখ করা যেতে পারে

"জহি মন পবন ন সনচরই রবি সসি নাহি পবেস
তহি বঢ় চিত্ত বিসাম করু সরহেঁ কহিআ উ এস।"

অর্থাৎ "যেখানে মন পবন সঞ্চরণ করেনা সেখানে রবি শশী প্রবেশ করেনা। সেখানে হে মূঢ় চিত্ত বিশ্রাম করে-সরহ এই উপদেশ উচ্চারণ করেছেন।"

চর্যাপদগুলির রচয়িতা কারা? দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা এসকল গানের রচয়িতা। বৌদ্ধ সহজিয়া মতের নানা তত্ত্বকথা-এই গানগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে প্রচারিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের দুটো প্রধান শাখাঃ হীনযান ও মহাযান। মহাযান মতবাদ থেকেই পরবর্তী কালে সহজিয়া মতের উদ্ভব হয়।

এখন প্রশ্ন জাগে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরাই এদেশে প্রথম বাংলা ভাষায় (প্রাচীন বাংলাভাষা) সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রপাত করেন। এদেশে কি তখন শুধু বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন-হিন্দু ছিলেন না বা শিক্ষিত হিন্দু ছিলেন না। অষ্টম (বা সপ্তম) শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত কোন হিন্দু লেখকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি?

হলায়ুধ মিশ্রের কাব্য *সেক শুভোদয়া* একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা। হলায়ুধ মিশ্র ব্যতীত আর কোন অবৌদ্ধ লেখকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু কেন? লক্ষ্যণীয় যে হলায়ুধ মিশ্রের *সেক শুভোদয়ায়* মুসলিম সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের সপ্তদশ পরিচ্ছেদের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি লক্ষ্য করলেই তা পরিষ্কার হয়ে উঠে।

'মধ্যে আছে পীরের মোকাম
তস্যোপরি বিদ্যতে প্রধান পুরুষের স্থান;
তীয়াঞ্জলি তাহার নামে দান।
পূর্বের উদয়াচলে পর্বতের নাম
উদয়সূর্য্য প্রত্যুষে বিহান
কিরাত জানিয়া আমার মোকামের করিব সম্মান
চতুর্থ অঞ্জলি তাহার নামে দান
উত্তরে হিমাচল দেবের অবস্থান।
তথা আমি করিব প্রয়াণ।

সংস্কৃত মিশ্রিত বাংলায় এ কাব্য রচিত। 'ভাটীয়ালী রাগেন গীয়তে'- 'তস্যোপরি বিদ্যতে'- এইসব বাক্যাংশের ব্যবহার থেকে বুঝা যায় সাহিত্যে বাংলা ভাষার পূর্ণ ব্যবহার হতে তখনও অনেক দেরী। একাদশ শতকের (?) জয়দেবও বাঙ্গালী কিন্তু তিনি সাহিত্যচর্চা করছেন সংস্কৃতে- লিখেছিলেন গীতগোবিন্দ। প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাচ্ছে হিন্দুর হাতে বাংলাভাষার সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস হয়নি- হয়েছিল বৌদ্ধদের হাতে।

তাম্রশাসন গুলিতে কি বাংলাভাষার ব্যবহার করা হয়েছিল? অনুমান করা হয়েছে যে বাংলায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম তাম্রশাসন ধানাইদহের (নাটোর) তাম্রশাসন। এটি ৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত। মহাস্থানগড়ে (বগুড়া) প্রাপ্ত শিলালিপি প্রাকৃতে উৎকীর্ণ। অনুমান করা হয়েছে এটি তৃতীয় শতাব্দীর। পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি সংস্কৃত ভাষায়। আসামে (কামরূপ) প্রাপ্ত-ভাস্করবর্মার-তাম্রশাসন ও সংস্কৃতে রচিত। এসব তাম্রশাসনে রাজবংশের প্রশংসা থাকতো। সাহিত্যে সৃষ্টির নিদর্শন হলেও বাংলাভাষায় এগুলি মোটেই রচিত হয়নি।

পালবংশের রাজত্বকালে তৎকালীন বাংলায় যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা বাংলাদেশে কেন সংরক্ষিত হলোনা বা বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে কোন নিদর্শন বা ভাষার নমুনা কোন লিপি থেকে আবিষ্কৃত হলোনা, সে রহস্যের সমাধান কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব কি? তাই প্রশ্নের উত্তর উদ্‌ঘাটনে শুধু কি অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্তই আমাদের মেনে নিতে হবে?

প্রশ্ন আরও দুটি থেকে যায় এবং শুধু বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্বী সিদ্ধাচার্যরাই সাহিত্য রচনায় অগ্রণী হলেন কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যে চর্যাগানে কোন শাসনকর্তা বা নৃপতির উল্লেখমাত্র নেই কেন?

ডাক খনার বচন রামাইপন্ডিতের শূণ্যপুরাণ ইত্যাদিকেও অনেকে প্রাচীন যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন বলে মনে করেন। ডাক ও খনার বচন অবশ্য মৌখিক তথা লোক সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। যদিও এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এগুলি সংগৃহীত হয়েছে পরবর্তী কালে। শূণ্যপুরাণ অবশ্যই প্রাচীন যুগের নয়- কেননা যে পাঠ বা লিপি পাওয়া গেছে তার মধ্যে অসংখ্য প্রক্ষেপ বিদ্যমান।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কাল যদি একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হয়ে থাকে তবে প্রাচীন যুগের অবসানে মধ্যযুগের আরম্ভ কখন? এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হয়ে পড়ি। চর্যাপদ ও মধ্যযুগের আদি কাব্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (এবং *ইউসুফ জুলেখাও*) এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কালের সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না কেন? শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রচনা কাল যদি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ধরা যায়- তাহলে দ্বাদশ শতাব্দীর পর ত্রয়োদয় শতাব্দী ও চতুর্দশ শতাব্দীর অর্ধেক-এই দেড়শ বা দুশো বছরের বাংলা



সাহিত্যের নিদর্শন কোথায়? সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ একে 'অন্ধকারযুগ' বলেছেন। এই অভিধা কতটুকু সার্থক তা তর্ক সাপেক্ষ। বৌদ্ধ হিন্দু শাসনের অবসানের পর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী কালে অস্থিরতা অনিশ্চয়তা বিদ্যমান ছিল সে কথা অবশ্যই স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায়। এ কারনেই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই অনিশ্চিয়তার কাল দীর্ঘ দুশো বৎসর এটাও অস্বাভাবিক মনে হয়। তাহলে রহস্য কিন্তু থেকেই যায়। সমস্যার সমাধান হয় না।

রাজনৈতিক প্রশাসনিক বা সামাজিক অস্থিরতা অনিশ্চয়তা সত্যি সত্যি এত দীর্ঘকাল ব্যপ্ত ছিল? তা-ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ইতিহাসে কি এমন প্রমাণ মিলে? সাহিত্য-প্রতিভার অভাব? কি এর উত্তর?

# বাঙলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ ও তার নবমূল্যায়ন

মুহম্মদ আবদুল খালেক

বাঙলা সাহিত্যের দীর্ঘকালের একটি ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, বাংলা সাহিত্যের সূচনা-পর্ব থেকে আজকের আধুনিক কাল পর্যন্ত তা একই ধারায়, একই খাতে প্রবাহিত হয়ে আসেনি, যুগে যুগে, কালে কালে বাঙলা সাহিত্যের গতিধারার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এই গতি পরিবর্তনের ধারাকে অবলম্বন করেই বাঙলা সাহিত্যকে বিভিন্ন পর্বে বা যুগে ভাগ করে নেয়া হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের এই যুগ বিভাগ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই। কেউ বলেছেন কোন প্রতিভাবান কবি-শিল্পী অথবা মহাপুরুষ যাঁর প্রভাবে সাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত এবং আর্দশের ক্ষেত্রে কোন নবচেতনার উন্মেষ ঘটে, তাঁকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যের যুগ বিভাগ করা বাঞ্ছনীয় যেমন-প্রাক্ চৈতন্য যুগ, চৈতন্য যুগ, রবীন্দ্র যুগ প্রভৃতি। আবার অনেকের ধারণা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সাথে সাহিত্যের একটি ঘনিষ্ট যোগ আছে। দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যের আদর্শ-রীতি, চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিবর্তন সাধিত হয়, সুতরাং রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যের যুগ বিভাগ হওয়া উচিত যেমন-প্রাক্ তুর্কী যুগ, তুর্কী যুগ, স্বাধীন মুসলিম বাঙলা, মুঘল আমলের বাঙলা সাহিত্য, ইংরেজ আমলের বাঙলা সাহিত্য, বাঙলা সাহিত্যে পাকিস্তান যুগ প্রভৃতি। তৃতীয় মতের পরিপোষক যাঁরা, সাহিত্যের যুগ বিভাগকে তাঁরা অনেকটা সহজতর করে নিয়েছেন। সময়ের হিসেবটাই তাঁদের কাছে বড়। সাহিত্যের যুগ বিভাগ তাঁরা করেছেন শতাব্দীকে কেন্দ্র করে। বাঙলা সাহিত্যের এই যুগ বিভাগের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যত মতবিরোধই থাকুক না কেন, একটি বিষয় সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহে যে, বাঙলা সাহিত্য তার আদিকাল থেকে বর্তমান কাল অবধি একই খাতে প্রবাহিত হয়ে আসেনি।

সাহিত্যে যুগ বিভাগের ক্ষেত্রে কোন মতবাদকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করাবার নানা রকম অসুবিধে আছে। আর যাকে আমরা আধুনিক যুগের সাহিত্য বলে দাবী করছি, হাজার বছর পর আমাদের এই আধুনিক সাহিত্য কি নামে চিহ্নিত হবে, সে কথা নিশ্চয়



করে বলা আজ বড় সহজ কথা নয়। মানুষের আদর্শ মতবাদ, চিন্তাভাবনা কোথাও স্থির হয়ে বসে নেই। আমাদের বর্তমান কালের সাহিত্যে কিছু অভিনব চেতনার উন্মেষ ঘটেছে এবং সেই নবচেতনাকে আধুনিক যুগলক্ষণ বলে চিহ্নিত করে তাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলে অভিহিত করছি। কিন্তু সাহিত্যে এই নবচেতনার উন্মেষ আজকের কোন নতুন ঘটনা নয়। যুগে যুগে কালে কালে সাহিত্যে এই নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছে যার ফলে প্রত্যেক যুগের মানুষই তার নিজের কালের সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্য বলে জেনেছে, গর্ব অনুভব করেছে। কিন্তু কালের কবলে তাদের সে ধারণা টেকেনি। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, দৌলতকাজী, আলাওল যে সময়ে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন, তাঁদের সমসাময়িক কালের মানদণ্ডে সেগুলো হয়তো আধুনিক সাহিত্য' বলেই পরিচিতি ছিল, কিন্তু আজকের গবেষণা তাঁদের সে শিল্পকর্মকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের খাতে ফেলেই বিচার করছে। বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সীমারেখা ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু হাজার বছরপরের গবেষণা আজকের নির্দ্ধারিত মধ্যযুগের সীমারেখাকে পুরোপুরি মেনে নেবে কি না তার নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে কোন কথার শেষ নেই, কোন সিদ্ধান্তের ইতি নেই। শেষ কথার পরে আরও অনেক নতুন তথ্য উদঘাটিত হতে পারে, কোন নতুন কথা সংযোজিত হতে পারে।

বাঙলা সাহিত্যকে আজ আমরা যে চেহেরায় দেখছি তা একদিনে বা একযুগে গড়ে ওঠেনি। শিল্পী সাহিত্যিকদের দীর্ঘকালের সাধনার ফসল আজকের বাঙলা সাহিত্য। কাজেই বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাকে কোথাও কখনও বিচ্ছিন্ন করে দেখা সমীচীন হবে না। এ কথাটি শুধু বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আধুনিক কালে সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে শুধুমাত্র সাহিত্যের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকতে পারি না। সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে আমাদেরকে প্রবেশ করতে হয় দেশ, জাতি, তার রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজ কাঠামো প্রভৃতি সীমারেখার মধ্যে। যে মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করছে, সেই মানুষের ধর্মীয় চেতনা, সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক কাঠামো প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে যদি আমাদের যোগসূত্র না থাকে, তাহলে তাঁর রচিত সাহিত্য বিশ্লেষণ আমাদের কাছে থেকে যাবে অপূর্ণাঙ্গ। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত একটি মূল্যবান কথা বলেছেন- "কতগুলি ঘটনার পুঞ্জীকৃত সমীকরণ যে ইতিহাস নয়, তার যে বিশেষ ধরণের আত্মা আছে, তার বিকাশ আছে, এ কথা মেনে না নিলে চলে না আদপেই। ইতিহাসের মূল কথা হলো অর্থনীতির কথা। তাকে বলবো

বনিয়াদ, সমাজ সাহিত্য, শিল্প দর্শনের হর্ম্য যদি তৈরী হয় তা বনিয়াদের উপরেই হবে, হবে বনিয়াদকে অবলম্বন করেই।[১]

সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগের কোন সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নিরূপন করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। পূর্ববর্তী যুগের চিন্তাধারা এবং আদর্শের প্রতিফলন পরবর্তী যুগের সাহিত্যে আদৌ ঘটবে না, এমন কখনও হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্তের আরেকটি বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, -"ইতিহাস তাই আকস্মিকের মালা নয়: একটা ধারাবাহিকতা আছে, একটা ক্রমবিকাশের পথে তার অগ্রগমন: মূল জীবন-বীজ তার অর্থনীতিতে আর কাণ্ড পত্র ফুল ফলের সমারোহ তার সমাজ-রাজনীতি আর শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এ ক্রমবিকাশের আবার নিজস্ব ছন্দ আছে। এ গতির পথ রেখাও অনুসরণ করা চলে, কোন দৈবের কোন অসম্ভবের অনুসন্ধানের হাতড়ে না বেড়িয়েও। যুগে যুগে পর্বে পর্বে ইতিহাসের যে টুকরো টুকরো পরিকল্পনা তারা স্বয়ম্ভু নয় কেউ, আকাশ থেকে পড়ে না, শূন্যে ফোটে না। পূর্ব যুগের বীজ থেকে উত্তর যুগের অঙ্কুর তার দ্বিদল পত্রের সবুজ শোভা আকাশে মেলে ধরে। এক যুগের অন্তরে ঘুমিয়ে থাকে তার পরবর্তী যুগের সম্ভাবনা।"[২]

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণ রাখবার বিশেষ যৌক্তিকতা আছে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস শুধুমাত্র একটি কালানুক্রমিক তালিকা নয়, আকস্মিকের সমন্বয়ে তা গড়ে ওঠে নি। পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্য লক্ষণগুলোর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় পরবর্তী যুগের সাহিত্য। কোন একটি বিশেষ সুর হয়তো অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে একটি বিশেষ যুগের সাহিত্য স্বরূপের মধ্য দিয়ে-পরবর্তী যুগে সুরের এই সূক্ষ্মঝরণাধারাই হয়তো মূল নদী প্রবাহে পরিণত হবে।

যে কোন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের ইতিহাস ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত এ কথা আগেই বলা হয়েছে। দেশের মানুষের সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রক্ষমতা। কাজেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের যুগ বিভাগ বা স্তর বিভাগ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী বিজ্ঞান সম্মত। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশের পাল শাসন, সেন শাসন, তুর্কী শাসন, মোগল আমল, ইংরেজ আমলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রত্যেক শাসন ব্যবস্থার সাথে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তৎকালীন সৃষ্ট সাহিত্যগুলো পর্যালোচনা করলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।



বাংলা সাহিত্য উদ্ভবের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকবৃন্দ যে সমস্ত উপকরণ হাতে পেয়েছেন তা থেকে বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভবকাল পাল শাসনামলে গিয়ে পড়েছে। যদিও একটি ব্যাপার খুব স্পষ্ট যে বাঙলা অক্ষরের বিবর্তনের ধারায় অশোক শিলা লিপির তুলনায় গুপ্ত শাসনামলের অক্ষর অনেকটা বাঙলা লিপির আকৃতি লাভ করেছে। কাজেই সেই অক্ষরের সাহায্যে গুপ্ত আমলেই বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু গুপ্ত আমলের কোন বাঙলা রচনা আমাদের হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত পাল আমলের রচনাগুলোকেই বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই। বাঙলা রচনার সূচনা পর্বেই আমরা যে শিল্প নিদর্শন পেয়েছি তা সত্যি অভাবনীয় ও বিস্ময়কর। সে যুগের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন কবিদের রচনায় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

পালদের পরে এ দেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় সেন শাসকদের হাতে। সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সংস্কৃত ছিল তাঁদের মাতৃভাষা। বাঙলা ভাষাকে তাঁরা ইতর শ্রেণীর ভাষা বলে মনে করতেন, যার ফলে এই সময় বাঙলা সাহিত্য চর্চা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। সেনেদের কাছ থেকে যাঁরা এ দেশের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন, তাঁরা জাতিতে তুর্কী, ধর্মে মুসলমান। আমাদের দেশে তুর্কীদের আগমন ঘটে ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে। তুর্কীদের আগমনের পর বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তুর্কী আক্রমনের প্রতিক্রিয়া কি রূপ নিয়েছিল এবার তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

তুর্কী বিজয়ের দেড়'শ বছরের মধ্যে দেশে কোন রকম বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি, এ সম্পর্কে আমাদের ঐতিহাসিকবৃন্দ প্রায় সবাই কমবেশি একমত। কোন কোন ঐতিহাসিক এর সময়সীমাকে দু'শো বছর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতককে তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের ঘোরতর অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে *বন্ধ্যাত্বের* তীব্র বেদনায় জর্জরিত এই দুটো শতাব্দী এবং বাঙলা সাহিত্যের এই *বন্ধ্যাত্বের* জন্য মূলতঃ দায়ী তৎকালীন তুর্কী শাসকবর্গ। অভিযোগটি কতদূর সত্য তা আজ গবেষণা সাপেক্ষ।

তুর্কীদের আগমনের ফলে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সে বিষয় নিয়ে নানা রকম মত পার্থক্য রয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের অনেকেই তুর্কীদের আগমনকে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের বিপর্যয় বলে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ক'জন বিশিষ্ট পণ্ডিতের বক্তব্য আমরা

এখানে স্মরণ করতে পারি। জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন- "তুর্কীদের বাঙ্গলা বিজয়েরকালে দেশের উপর দিয়া একটি প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশে সাহিত্য বা বিদ্যাচর্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহা একটি যুগান্তরের কাল। দেশময় মারামারি, কাটাকাটি, নগর ও মন্দির ধ্বংস, অভিজাত বংশীয় পণ্ডিতদের উচ্ছেদ প্রভৃতি অরাজকতা চলিয়াছিল। এরূপ সময়ে বড়দরের সাহিত্য হওয়া অসম্ভব।"[৩]

সুনীতি বাবুর উক্তি থেকে মনে হচ্ছে নগর মন্দির ধ্বংস এবং অভিজাত বংশীয় পণ্ডিতদের উচ্ছেদ করে তুর্কী শাসকবর্গ তখন সমগ্র দেশে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে এই সময় কোন রকম সাহিত্য সৃষ্টি করবার মত মানসিক অবস্থা শিল্পীদের ছিল না। সুনীতি বাবুর বক্তব্যের প্রতিফলন আমরা আরও অনেকের লেখাতেই লক্ষ্য করবো। যেমন তুর্কী শাসকদের উপর বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের অভিযোগ চাপিয়ে দিয়ে কনক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,- "দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষে পূর্বভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। ইহার পর দেড়শত বৎসর ধরিয়া এ দেশে ধ্বংসের লীলা বহিয়াছিল। এই লুণ্ঠন ও ধ্বংসের ফলে বাংলাদেশে এ যুগে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বাঙালীর মনে বহুকাল ধরিয়া বর্তমান ছিল। দেশে তখন শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত। এরূপ অবস্থা সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নহে। কাজেই-সাহিত্য সৃষ্টি তখন, ঘটিয়া ওঠে নাই।"[৪]

বাঙলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবও গতানুগতিক ধারাকেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। তুর্কী শাসনের প্রথম দেড়'শ বছরের সাহিত্য চর্চা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন,-"এ পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহে বাঙ্গলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ছিল না। সেই জন্য সাহিত্য চর্চা নামে মাত্র ছিল। বস্তুতঃ মুসলমান অধিকার কাল হইতে এই সময় পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালা সাহিত্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমরা এই ১২০১ হইতে ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্ধকার বা সন্ধিযুগ বলিতে পারি।"[৫]

অন্ধকার যুগের সাথে 'সন্ধিযুগ' কথাটি যোগ করায় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের উক্তির মধ্যে একটি বিশেষ সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, তবে দেশের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে জন-জীবনের শান্তি বিঘ্নিত হওয়া এবং সে কারণে সাহিত্য চর্চা বন্ধ থাকার পক্ষেই তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই যুগের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গোপাল হালদার মহাশয় বলেছেন-"খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৩৫০



কেন, খ্রীঃ ১৪৫০ অব্দ পর্যন্ত বাঙলার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক আঘাতে ও সংঘাতে, ধ্বংসেও অরাজকতায় মুর্ছিত অবসন্ন হয়ে ছিল। খুব সম্ভব, সে সময়ে কেউ কিছু সৃষ্টি করবার মত প্রেরণাই পায়নি। অন্ততঃ বাঙলা ভাষায় যদি কিছু তখন হয়েও থাকে তার একটি ছত্রও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। বাঙলা ছাড়া অন্য ভাষায় লেখা যা হয়েছে, তাও সামান্য। এই সন্ধিযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে তাই সাহিত্য শূণ্যতার ইতিহাস।"[৬]

অন্ধকার যুগের সময় সীমা নিয়ে অন্যান্য পণ্ডিতদের বক্তব্যের সাথে গোপাল হালদার মহাশয়ের বক্তব্যে একটি বিশেষ বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর সবাই যখন অন্ধকার যুগের সীমারেখা নির্দ্ধারিণ করেছেন দেড়'শ বছর বলে, গোপাল হালদার মহাশয় এই সময় সীমাকে টেনে আড়াই'শ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন। ইতিহাসের সঙ্গে যে তাঁর বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না, সে সম্পর্কে একটু পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। এর পর অন্ধকার যুগ সম্পর্কে আমরা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্যের উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছেন-"তুর্কীরা শুধু দেশ জয় করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহারা বাঙলার ধর্ম ও সমাজ জীবনে গুরুতর আঘাত হানিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য বিজিত দেশে যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বাঙলাতেও সেই নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ-বিহারের মধ্যে একটা ব্যাপক ধ্বংস অভিযান চলিয়াছিল, এবং অনেকটা এই কারণেই বোধ হয় তুর্কী বিজয়ের পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্য রচনায় আর কোন নিদর্শন মিলে না। মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাবলী বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছিল ও এই অন্তবর্তীকালের সমস্ত বাংলা রচনাও বিনাশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। সেইজন্য চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একটি বিরাট শূণ্যতার যুগ।"[৭]

তুর্কীদের আক্রমণ এবং বাঙলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সেই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন,-"তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালীর বিদ্যা ও সাহিত্য চর্চারমূলে কুঠারাঘাত পড়িল। দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষে পূর্ব ভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। তাহার পর হইতে দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে ধ্বংসের অরাজকতার তাণ্ডবলীলা চলে। দেশের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে কেন্দ্র ছিল, সেই গুলি সর্বাগ্রে বিধ্বস্ত হইল এবং বুদ্ধি বিদ্যা কৌশলে যাঁহারা শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন, তাঁহারা রণক্ষেত্রে শায়িত হইলেন, নতুবা আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। দেশে শান্তি নাই সুতরাং সাহিত্য চর্চা তা হইতেই পারে না।"[৮]

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোপাল হালদার প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের বক্তব্যগুলোকে একসঙ্গে গুছিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা মোটামুটি তুর্কী আক্রমণ এবং তাদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তুলতে পারি তা হোল- একঃ তুর্কীদের বাংলাদেশে আক্রমণ এবং তাদের দু'শ বছর শাসনের ইতিহাস আসলে বিপ্লব আর বিদ্রোহের ইতিহাস, দেশময় মারামারি-কাটাকাটি, নগর-মন্দির ধ্বংস, অভিজাত বংশীয় পণ্ডিতদের উচ্ছেদের ইতিহাস। দুইঃ তুর্কীদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ জুড়ে প্রতিরোধ আন্দোলন, সর্বাত্ম সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষেরই ফলশ্রুতি 'বাঙলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ।' যদিও বাংলা সাহিত্যের ক'জন দিক্‌পাল পণ্ডিতের অভিমত এগুলো। তাঁদের বক্তেব্যের পর আর কিছু বলার থাকতে পারে, এমন দুঃসাহস আমাদের না হবারই কথা। কিন্তু এ সত্যটিও ভুলে গেলে চলবে না, সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় কোন কথার শেষ নেই। শেষ কথা বলার পরও কালের গতির সাথে সাথে আরও অনেক নতুন কথা, নতুন তথ্যের সংযোজন ঘটতে পারে। এই দৃষ্ঠিকোণ থেকেই 'বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ' সম্পর্কিত ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোপাল হালদার প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের বক্তব্যগুলো কতখানি ইতিহাস নির্ভর তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

তুর্কীদের আগমণের কালে তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে বড় রকমের বিপ্লব বা প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল এমন কথা যাঁরা বলতে চান, ইতিহাসের একটি ঘটনার দিকে আমরা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। তুর্কীরা যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, তখন বাংলার শাসনভার ছিল রাজা লক্ষ্মণ সেনের হাতে। কথিত আছে তুর্কীদের আক্রমণের সংবাদ পাবার সাথে সাথে বাঙলাদেশের তৎকালীন রাজা লক্ষ্মণ সেন নিজের প্রাণ নিয়ে ছদ্মবেশে কোন রকমে তাঁর বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন মতান্তরে ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়া বিজয় সম্পন্ন করেন, এটি গল্প নয়, ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় সম্পর্কে ইতিহাস আছে।

"In 1201 he left Bihar with a large body of horse and marched so rapidly against Nadiya, the capital of Bengal that when he arrived at the City, only eighteen of his Companions had been able to keep pace with him. Nadiya was partly deserted at his time, and the Muslim commander and his



eighteen companions were able to pass through the City gates unchallenged as horse dealers from the north. Reaching the Raja's palace on the banks of the Ganges, they cut down the guards. But Raja Lakshman Sena escaped through a pastern gate by boat."[৯]

দেশের রাজা যখন তুর্কীদের আক্রমণের খবর পাবার সাথে সাথে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেছেন, সে ক্ষেত্রে বিদ্রোহ বিপ্লবের ধারণা নিতান্তই কাল্পনিক। এই সময় বিদ্রোহ বিপ্লবের সমর্থনে ইতিহাসও কোন কথা বলে না। আসলে তুর্কীরা বাঙলা দেশের যেখানেই গেছেন, অনায়াসে সে অঞ্চল তাঁদের দখলে এসেছে। বাঙলা দেশের কোন অঞ্চলেই বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে তেমন কোন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে নি। প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলার মত কোন সামর্থ্য সেন রাজাদের ছিল না। লক্ষ্মণ সেনের শাসনকাল আসলে সেন রাজ বংশের অবক্ষয়ের যুগ। আভিজাত্যের গর্বে সেন রাজারা তখন অন্ধ। প্রজাদের সাথে রাজার ছিল না কোন আন্তরিক সম্পর্ক। অভিজাত শ্রেণীর মানুষের অত্যাচার আর দুর্ব্যবহারে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ তখন জর্জরিত। এ ছাড়া লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালে রাজপরিবারে সদস্যরা কি রকম অনাচার ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের কি রকম চারিত্রিক অধঃপতন ঘটেছিল সে সবের প্রমাণ মেলে তৎকালীন রচিত 'সেক শুভোদয়া' নামক একটি গ্রন্থের বর্ণনায়।-

"লক্ষ্মণ সেন দেবের সুয়োরাণী 'বল্লভার', এক ভাই ছিল 'কুমার দত্ত', ভারি অত্যাচারী। সে একদা এক বণিক বধূ 'মাধবী'র উপর অত্যাচার করতে যায়। 'মাধবী'র চীৎকারে লোকজন এসে পড়ে এবং 'কুমার দত্ত'কে ধরে মন্ত্রীদের কাছে বিচারের জন্য নিয়া যায়। রাজার প্রিয় পত্নীর ভাই বলে মন্ত্রীরা স্বয়ং শাস্তি দিতে অসমর্থ হয়ে মাধবীকে রাজসভায় যেতে বলেন। প্রজারা সব মাধবীকে নিয়ে রাজসভায় গেলে মন্ত্রীরাও সেখানে হাজির হলেন। রাজার কাছে প্রজারা সাহস করে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না দেখে জগদগুরু গোবর্ধনাচার্য বললেন- 'ভোজনাঃ কার্যংবদত।' তখন সাহস পেয়ে মাধবী আত্মীয় কুটুম্বদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সব কথা বললে। ইতিমধ্যে চেড়ীর মুখে খবর পেয়ে রাজমহিষী বল্লভা এসে সভার পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। মাধবীর অভিযোগ শুনে 'বল্লভা' ভ্রাতার বিরোধী মন্ত্রী উমাপতি ধরকে লক্ষ্য করে বললেন,- 'হে সভাসদাঃ পাপিষ্ঠো অসাধুমাপতিধরঃ তসৈব এষা কৃত্যাঃ ইতি বিজ্ঞায় যৎকর্তব্যং তাদ্বিধীয়তাম্।'- শুনে রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ সকলে চুপ করে রইলেন। তখন মাধবী রাণীর পায়ে প্রণাম

করে বললে, আপনি ধর্মপরামাতা, সমরবিজয়ী মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেনের পত্নী, আমাকে ক্ষমা করুন। এই রাজ্যে এতদিন ধর্ম ছিল শাশ্বত,..... এখন বুঝলুম শূরভোগ্যা বসুন্ধরা। আপনার পিতৃকুলে কি এই ব্যবহার চলিত আছে? তা যদি থাকে বলুন, আপনারই ভাইকে ভজনা করি। এই কথা শুনে বল্লভা ক্রোধে মাধবীর চুল ধরে টেনে পদাঘাত করলেন। ভয়ে কেউ বাধা দিতে পারলে না।"[১০]

কুমার দত্ত ও বল্লভার আচার আচরণের মধ্যে তৎকালীন সমাজের বাস্তব ছবিই ফুটে উঠেছে। বলদর্পী শাসকগোষ্ঠীর হাতে সাধারণ মানুষ প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছে, মুখ বন্ধ করে তাদের সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছে। লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালে সম্ভবতঃ অভিজাত শ্রেণীর মানুষের নৈতিক চরিত্রের মারাত্মক অবনতি ঘটেছিল। অসঙ্গত যৌন বিহার ও মিলনে সম্ভবতঃ বিশেষ কোন অপরাধ ছিল না। "ধোবী তাঁর পবন দূতে যুবক যুবতীর কামলীলার সোৎসাহ চিত্র এঁকেছেন। বাৎসায়ন তাঁর কামসূত্রে বঙ্গ ও গৌড়ের রাজ অন্তঃপুরের মহিলাদের ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী, দাস ও ভৃত্যদের সাথে কামচক্রান্তের উল্লেখ করেছেন।"[১১]

এই সমস্ত ঘটনা থেকে অনুমান করতে বাধা নেই, লক্ষ্মণ সেনের শাসনামালে ব্রাহ্মণ সমাজও সংস্কার ক্ষয় ও ধ্বংসের এক প্রান্ত সীমায় এসে উপস্থিত হয়। এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ছবি সে যুগের সাহিত্য সংস্কৃতিতে সুস্পষ্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'History of Bengal' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে- "Certain it is that the literature of the Sena Period and the religious tests and parctices of the later phases of both Hinduism and Budhism occasionally, betray a degradation in ideas of decency and sexual morality which could not but seriously affect the healthy development of moral and social life"[১২]

লক্ষ্মণ সেনের সময়ে একদিকে যেমন সর্বশ্রেণীর মানুষের চারিত্রিক অধঃপতনের নিদর্শন পাওয়া যায়, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কটও তীব্র আকার ধারণ করে। শাসকদের রাজপ্রাসাদ ও নাগরিক জীবনের ভোগ-বিলাস এবং চাকচিক্যময় জীবনের পাশেই আমরা দেখতে পাই সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের শুধু হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দিয়ে সমাজকে শুধু সেবাই করে গেছে, প্রতিদানে পেয়েছে ঘৃণা, অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা। দুঃখ-দারিদ্র্যই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেই দারিদ্রপূর্ণ জীবনের একটি বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে নিম্নলিখিত কবিতায়-



"বৈরাগ্যিক সমুন্নতা তনুতনুঃ শীর্ণম্বরং বিভ্রতী।
ক্ষুৎ ক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিশ্চ শিশুভির্ভোক্তুং সমভ্যর্থিতা।।
দীনা দুঃস্থ কুটুম্বিনী পরিগলদ্ ব্যস্পাম্বুধৌতাননা
প্যে কং তণ্ডুল মাকং দিনশতং নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি।"

অর্থাৎ- 'নিরানন্দে তার দেহ সমুন্নত ও শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র। ক্ষুধায় চোখ ও পেট বসে গেছে শিশুদের, তারা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাইছে। দীন দরিদ্র গৃহিনী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে যেন একখান তণ্ডুলে এক'শ দিন চলে যায়।'[১৩]

এ ছাড়া দুঃখ-দারিদ্র্যের আরও মর্মান্তিক বর্ণনা তৎকালীন রচিত কবিতায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি। জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির রচনায় দারিদ্র্যের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা নিম্নরূপ-

"শিশুরা ক্ষুধায় আকুল, দেহ শরের মত শীর্ণ, আত্মীয়স্বজন বিমুখ, পুরানোও গাড়ুতে এক ফোটা মাত্র জল ধরে,-এ সকল আমাকে তত কষ্ট দেয়নি যেমন কষ্ট দিয়েছিল গৃহিনী যখন কাতর হাসি হেসে ছেঁড়ে কাপড়টুকু সেলাই করবার জন্য রুষ্ট প্রতিবেশীর কাছ থেকে সূচ চাইছিল তা দেখে।"[১৯]

মোটামুটি এই হোল সেন রাজদের শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নিম্ন বর্ণের নিগৃহীত ও বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক জীবন চিত্র। এর পর আসে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের কথা। সেনেরা ছিলেন কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত তাঁদের মাতৃভাষা। বাংলাদেশ সেনেদের দখলে আসবার সাথে সাথে বাঙালীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় সংস্কৃত ভাষার বোঝা। নির্দেশ দেয়া হয় যদি কেউ অষ্টাদশ পুরাণ বা রামায়ন বাংলা শ্রবণ করে, তাহলে সে রৌরব নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। প্রত্যেক দেশে, যুগে যুগে মাতৃভাষাই জাতীয় চেতনার মূল উৎস হিসেবে কাজ করে আসছে। কাজেই বাঙালীদের মাতৃভাষায় যখন সেনেরা আঘাত হেনেছে, তখনকার দিনে বাঙালীর জাতীয় চেতনায় এর জন্য কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে নি, এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

সুতরাং যে শাসন ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর মানুষের কাছে সাধারণ মানুষকে প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, বলদর্পী শাসকের হাতে নারীর মান মর্যাদাকে নির্বিচারে বিসর্জন দিতে হয়েছে, দু'মুঠো অন্নের জন্য যাদেরকে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, নিজের মাতৃভাষা চর্চার অধিকার থেকে যে দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়েছে, সে দেশের মানুষ এই শাসক শ্রেণীর নেতৃত্বে তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে বড় রকমের প্রতিরোধ গড় তুলবে,

এমনটি আশা করা যায় না। বরং সেনেদের শোষণ-নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পাবার আকাঙ্খায় তৎকালীন বাঙলা দেশের আপামর জনসাধারণ তুর্কীদের আগমনকে অভিনন্দন জানিয়েছে। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতাটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাজেই তুর্কীদের আগমনে বাংলা দেশে বিপ্লব বিদ্রোহের কথা বলে যাঁরা ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতককে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নত করতে চান, যুক্তির দিক থেকে তাঁদের সে অভিযোগ আদৌ টেকে কিনা তা আজ নতুন করে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

তুর্কীদের আগমনে এবং তাদের অত্যাচার নির্যাতনের ফলে দেশে সর্বাত্মক সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল, ইতিহাস এমন কথা বলে না। নানা কারণে রাজা লক্ষ্মণ সেন জনসমর্থন হারিয়ে ফেলেছিলেন, যার ফলে আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। দেশের রাজা যেখানে পালিয়ে বেঁচেছেন, সেখানে তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠবে কার নেতৃত্বে?

তুর্কীরা অন্যায় অত্যাচার ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে এ দেশে নিজেদের শাসন ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, এমন দাবী বোধ করি ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভর নয়। তুর্কীরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী। সেনেদের শাসনকালে সাধারণ, মানুষ যখন নিজেদের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত অসহায়ভাবে দিনযাপন করছিল, তখন নবাগত মুসলমানদের আচরণে এমন একটি ভঙ্গী ছিল এবং কণ্ঠে ছিল সাম্য ভ্রাতৃত্বের এমন একটা নতুন সুর যা সেই কালের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনমনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তাঁরা অনেকেই ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শুধুমাত্র জোর করে তরবারীর সাহায্যে তুর্কীরা এ দেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, এমন অভিযোগের তেমন কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার মহাশয়ের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"বিজয়ী ব্যক্তির ধর্মমতের প্রাধান্য সহজেই সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে তথাপি এর আকর্ষণের মধ্যে কেহ কেহ এমন সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন যাতে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।"[১৫]

অভিজাত শ্রেণীর মানুষের হাতে যখন বাংলার সাধারণ মানুষ লাঞ্ছিত সেই সময় ইসলাম মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়েছে। সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ইসলামের মূলমন্ত্র। ইসলামে রাজা, প্রজা, ধনী, গরীব সবাই সমান। সামাজিক সমানাধিকারের এই আদর্শ এবং শ্রেণীগত সংস্কারের অনুপস্থিতিই বর্ণ-সংস্কারে জর্জরিত বাংলা দেশে



ইসলামের বিজয়াভিযানের অন্যতম কারণ। ব্রাহ্মণ্য শাসনে উৎপীড়িত মানুষের কাছে ইসলামের সমানাধিকারের আদর্শ প্রলোভনরূপে কাজ করেছে। ব্রাহ্মণ্য সামাজিক সংস্থার নির্মম বিধানে যারা নির্যাতিত হচ্ছিলেন,- বর্ণ সমাজের অন্তর্গত নিম্ন বর্ণের মানুষ এবং বর্ণসমাজের বাইরের অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষ, যারা প্রতি পদে পদে নিগৃহীত হচ্ছিলেন, ইসলামী সমাজ সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁরা সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিধান দাতাদের কাছে যারা ছিল শূদ্র এবং অস্পৃশ্য পর্যায়ের, ইসলাম তাদেরকে দিল মুক্ত মানুষের অধিকার এবং শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা। এ দেশে ইসলামের বিজয়াভিযান সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মন্তব্য করেছেন-

"নানা ভাবেই এই যুগে বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা সম্ভবপর হয় প্রধানতঃ দরবেশদের চরিত্র মাহাত্ম্যে, প্রচার তৎপরতায়, দান-ধ্যানে ও আত্মিক শক্তিতে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হিন্দু পুরোহিত তন্ত্রের অবসান ঘটায়; ইহাতে জন-সাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহারা মুসলমানদিগকে যুগ যুগান্তের ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচার অবিচার হইতে মুক্তিদাতা বলিয়া ভাবিতে লাগিল।"[১৬]

ইসলাম জনসাধাণের সামনে যে অনাড়ম্বর জীবনের আদর্শ তুলে ধরেছিল, এ দেশে ইসলাম প্রচারে তার অবদানও কম নয়। বাংলা দেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য যে সমস্ত পীর-দরবেশ এসেছিলেন, তাঁদের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা বিলাসিতার কোন রকম স্থান ছিল না। এই সমস্ত পীর-দরবেশের সাধুতা, নিষ্ঠা ও নির্লিপ্ত জীবন বাঙলা দেশের অসংখ্য নির্যাতিত শান্তিকামী মানুষের হৃদয়কে জয় করতে সমর্থ হয়। তুর্কী আমলে বাংলা দেশে যিনি প্রথম ইসলাম প্রচার করতে আসেন তাঁর নাম মখ্দুম শেখ জলালুদ্দীন তব্রীজী। এই দরবেশ বাঙলা দেশে এসে পাণ্ডুয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ, একখানি উদ্যান রচনা ও একটি 'খানকাহ্' প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে তাঁর এই খানকাহ্তে প্রতিদিন অসংখ্য দরিদ্র, দুঃস্থ, নিরন্ন ও পরিব্রাজক আহারাদি লাভ করতো। তিনি কি ভাবে হাজার হাজার লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন তার বহু কাহিনী 'শেক শুভোদয়া' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ দেশে মুসলমানদের বিজয়লাভ হয়তো কোন ক্রমেই সম্ভব হোত না, যদি না তাঁদের মধ্যে মানবতার স্বীকৃতি থাকতো।

বাঙলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন মূলতঃ তুর্কী আক্রমণকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে,-

"দেশের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে কেন্দ্র ছিল, সেইগুলি সর্বাগ্রে বিধ্বস্ত হইল এবং বুদ্ধি বিদ্যা কৌশলে যাহারা শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন, তাহারা রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন, অথবা আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিলেন।"[১৭]

তুর্কীদের আগমনের মুহূর্তে সমাজের শীর্ষ স্থানীয়দের রণক্ষেত্রে পতিত হওয়ার বিষয়টি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, তা বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। যেখানে দেশের রাজা পালিয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং প্রতিরোধের কল্পনা সম্ভবতঃ অবান্তর। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে দেশের শীর্ষস্থানীয়দের রণক্ষেত্রে পতিত হওয়ার প্রসঙ্গটি আমাদের কাছে একটু বিস্ময়কর মনে হয় না কি? এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের নিজের একটি উক্তিও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,- "প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া বাংলা চিরকাল ভারতবর্ষের রাজপথ হইতে সুদূরে ছিল। সুতরাং উত্তরাপথে তুর্কী অভিযান অনেকদিন শুরু হইলেও তাহা পল্লীবাসী সুখসুপ্ত বাঙালীর শ্রুতিপথে আসে নাই অথবা ঈষৎ কর্ণগোচর হইলেও ভীতির সঞ্চার করে নাই। যেহেতু ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে গ্রীক, শক, হূন প্রভৃতি বিদেশীর যে অভিযান হইয়া গিয়াছিল তাহার কোন ঢেউ বাংলা অবধি পৌঁছায় নাই। এই কারণে যখন মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের অধীনে মুষ্ঠিমেয় তুর্কী সৈন্য বাংলাদেশে উৎপাত আরম্ভ করিল তখন রাজশক্তি বা জনসাধারণ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্য এই আকস্মিক আঘাতে দেশের চিত্ত বিমূঢ় হইয়া গেল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিদেশী আক্রমণকারীকে সার্থকভাবে বাধা দিবার সামর্থ্য একেবারে লোপ পাইল।"[১৮]

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের এই বক্তব্য থেকে একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তুর্কীদের আকস্মিক আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য যে সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান প্রয়োজন, বিদেশী শক্তির মোকাবিলা করতে হলে যে ঐক্য এবং শৃঙ্খলার প্রয়োজন, সেনেদের মধ্যে তা আদৌ ছিল না। এর কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি এ সময় ব্রাহ্মণ্য শাসন ব্যবস্থায় আভিজাত্য গর্বী মানুষ অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থা শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে এই মানসিকতা বিরাজ করছিল। ফলে বিদেশী শক্তি যখন উন্নত মানের মারণাস্ত্রে সু-সজ্জিত হয়ে আক্রমণ চালিয়েছে, ভারতের কোথাও তাদের তেমন কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে নি। মুসলমানদের অভিযানের বহু আগে থেকেই ভারতবর্ষ বাইরের জগতের সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল, ফলে সমাজের দৃষ্টি বাইরের বিস্তৃতিও ব্যাপকতা হারিয়ে অন্তরে সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং এই সংকোচনের মধ্যেও নিজের অস্বাভাবিক ক্ষুদ্রতাকে মহত্ব বলে প্রতিভাত



হয়। সু-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'আল্‌বারুনী' ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে এ দেশ ভ্রমণ করতে আসেন। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি সে সময়কার অধিবাসীদের বিকৃত বুদ্ধি, অহঙ্কার, আভিজাত্যের গর্ব এবং যুক্তিহীন আত্মসর্বস্বতার কথা তাঁর অভিজ্ঞতায় লিপিবদ্ধ করেছেন।-"According to their belief there is no other Country like theirs, no sciences like theirs, no Kings like theirs, no other race of man but theirs, and no created beings besides them have any knowledge or science whatsoever."[১৯]

ঐতিহাসিক আলবারুণীর এই বর্ণনায় তৎকালীন সমাজের মানসিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাইরের প্রচারিত দৃষ্টিকে অন্তরের মধ্যে সংকুচিত করার ফলে এবং জীবন সম্পর্কে সব রকমের সৃষ্টিশীল গতিশীল আগ্রহ অনুরাগ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পক্ষে কাশী নবদ্বীপের শিক্ষা কেন্দ্রে ব্যাকরণের তর্ক নিয়ে মশগুল থাকা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের এই কূট তর্ক বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কিত কি না তা অনুসন্ধান করবার অবসর তাঁদের ছিল না; অথবা তাঁদের তর্কযুদ্ধ দ্বারা সমকালীন জীবন কোনভাবে উপকৃত হচ্ছে কি না তা বিচার বিশ্লেষণ করাও তাঁদের মনোজগতের অন্তর্গত ছিল না। তাঁরা তাঁদের মানস জগতের আভিজাত্য, সংস্কার-সংস্কৃতির আভিজাত্য সংরক্ষণের প্রতিই অধিক যত্নবান ছিলেন। বাইরের জগৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতায় কতখানি এগিয়ে গেছে, সে খবর সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বোধ করেন নি। এ দেশ ছাড়া পৃথিবীতে যখন আর কোন দেশ নেই, এ দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির সাথে তুলনীয় আর কোন সংস্কৃতি যখন নেই, তখন বাইরের আক্রমণের কথা তাঁদের ভাববার অবকাশ কোথায়? এ হেন মানসিকতাপূর্ণ সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্যের চর্চা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আত্মাভিমানের সাথে নানা ধরনের অর্থহীন আত্ম ধ্বংসী তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হয় দৃঢ়। জ্ঞানানুশীলনের পরিবর্তে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস কতখানি প্রাধান্য লাভ করেছিল তা অনুমান করা যায় সমসাময়িক কালের একটি রণনীতির পুঁথির উদ্ধৃতি থেকে। শত্রু সৈন্য চারদিক ঘিরে আক্রমণ করলে কর্তব্য কি, সেই সম্পর্কে উক্ত পুঁথিতে বলা হয়েছে- শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্যের গায়ে ভালো করে মখিয়ে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেই শত্রু সৈন্য পালিয়ে যাবে। বিদেশী শক্তি যখন উন্নতমানের অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত, তখন তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে তাদের মোকাবিলা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই দেখা যায় তুর্কীদের আক্রমণকে প্রতিহত করবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে বাঙলা দেশের তৎকালীন রাজা লক্ষণ সেন সদলবলে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। কাজেই তুর্কীদের আগমনকে কেন্দ্র করে অত্যাচার,

নির্যাতন, সংঘর্ষ-বিপ্লব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রণক্ষেত্রের কল্পনা করে এই সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করবার পিছনে তেমন কোন ঐতিহাসিক যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করতে পারি না।

তবে এ কথা ঠিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের তেমন কোন বাংলা রচনা আমরা পাইনি। এই সময়ের যথেষ্ট পরিমাণ বাংলা রচনা পাওয়া যায়নি বলেই তাকে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করতে হবে, এর যৌক্তিকতা নিয়ে পরে বিচার বিশ্লেষণ করা যাবে। এই দুটো শতাব্দীতে কোন রকম সাহিত্য সৃষ্টি না হওয়ার জন্য ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ বাংলায় তুর্কীদের আগমন এবং তাদের শাসন ব্যবস্থাকেই মূলতঃ দায়ী করেছেন। তাঁদের সে দাবী কতখানি যুক্তি নির্ভর, তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বাঙলাদেশে তথা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুর্কীদের আগমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তুর্কীদের আগমন বাঙলার সাহিত্য এবং তার জাতীয় জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তুর্কীদের আগমনের ফলাফল এ দেশের জন্য শুভ অথবা অশুভ হয়েছে, তা সত্যিকারভাবে বুঝতে হলে আমাদের বিচরণ করতে হবে ইতিহাসের সেই প্রাচীন অধ্যায়ে, উলটিয়ে দেখতে হবে প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি জীর্ণ পাতা। ভুলে গেলে চলবে না সাহিত্য ও সমাজের যোগসূত্র অত্যন্ত ঘনিষ্ট। প্রত্যেক সাহিত্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, পরতে পরতে একাত্ম হয়ে মিশে থাকে একটি সমগ্র জাতির ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-কল্পনা, চিন্তা-সাধনা। কাজেই বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে কোন কথা বলতে গেলে আগে আলোচনা করতে হবে বাঙালী জাতির ইতিহাস, তার সমাজের মর্মবাণী। প্রাচীন ইতিহাসের সরণী বেয়েই প্রত্যেক জাতিকে পৌঁছতে হয় তার বর্তমানের সিংহ দ্বারে। ঐতিহাসিকের সততা নিয়ে যদি আজ আমরা এ দেশে তুর্কী আগমনের সত্যিকার মূল্যায়ন করতে পারি, তাহলে তৎকালীন সমাজ-সাহিত্যে, রাজনীতি-অর্থনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া কত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

তুর্কীদের আগমনের অব্যবহিত পূর্বে বাঙলা দেশের শাসনভার ছিল সেন রাজাদের হাতে। সেনদের পূর্বে এ দেশ দীর্ঘদিন শাসন করেছেন পাল বংশীয়েরা। পালেরা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কাজেই পালরাজদের শাসনকালে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে। পালেদের প্রায় সবাই অত্যন্ত উদার প্রকৃতির শাসক ছিলেন। তাঁদের শাসনকালে দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে কখনও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় নি। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও দেশের মানুষের স্বাধীনতা ছিল।



এ প্রসঙ্গে শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- 'পাল রাজগণ ধর্ম মতে মহাযান বৌদ্ধ হইলেও বৈদিক ও স্মার্থ আচার-বিচারের প্রতিকুলতা করিতেন না।"[২০]

পালযুগের শাসন ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে অসিতবাবুর আরেকটি মূল্যবান উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।-

"পালগণ সাধারণ বাঙালীর সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা যে ধর্ম মতে বিশ্বাস করিতেন, তাহা সমকালীন বাঙালীরই গণধর্ম। তাঁহাদের লিপি লেখনেও জনসাধারণের কথাই বেশি করিয়া বলা হইয়াছে।"[২১]

পালেদের পূর্বে এ দেশের শাসনভার ছিল গুপ্ত সম্রাটদের হাতে। গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে দেশে সাহিত্য চর্চা চলে মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায়। বাংলা সাহিত্য চর্চার কোন নিদর্শন এই যুগে পাওয়া যায় নি। পাল রাজগণ যখন বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, তখন থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কিছু কিছু নিদর্শন মেলে। পালেদের সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, সাধারণভাবে সেগুলো চর্যাপদ বলে পরিচিত।

পাল শাসনের শেষ ভাগে দেশে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কৈবর্ত বিদ্রোহে মহীপাল নিহত হন। মহীপালের কনিষ্ঠ ভাই রামপাল অনেক চেষ্টা করে পাল সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের গতিকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করলেও তাঁর মৃত্যুর পর পাল বংশ বিলুপ্তির পথে চলে যায়। আত্মকলহ এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পাল বংশ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, সেই দুর্বলতার সুযোগে সেনেরা এ দেশের শাসন ক্ষমতা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। সেনেরা জাতিতে বাঙালী নন, কর্ণাট দেশীয়। বাঙলা ভাষা এবং বাঙলার মাটির সাথে সেনেদের কোন রকম যোগসূত্র ছিল না। বাঙলা দেশে তুর্কীদের মত সেনেরাও বহিরাগত। বাঙলা দেশে সেনেরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে যে রাজ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন, ইতিহাসে তা সেন রাজ বংশ নামে পরিচিত।

বহিরাগত সেনেদের হাতে বাঙলার শাসন ব্যবস্থা চলে যাওয়ার সাথে সাথে বাঙলার সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গুপ্ত শাসনকালে বাঙলা দেশের মানুষে মানুষে যে শ্রেণী বৈষম্য গড়ে ওঠে, সাহিত্য চর্চায় সংস্কৃত ভাষার যে প্রাধান্য ঘটে, পালেদের আমলে এর খানিকটা পরিবর্তন হয়। পালেদের সময়ে শ্রেণী বৈষম্য থাকলেও নিম্নশ্রেণীর মানুষের অবস্থা গুপ্ত শাসনামলের চাইতে অনেকখানি সম্মানজনক হয়ে ওঠে। নিম্নশ্রেণীর মানুষের মুখের ভাষা 'বাঙলা'

তৎকালীন সাহিত্যে স্থান করে নিতে সমর্থ হয়। 'চর্যাপদ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু বহিরাগত সেন বংশের শুরু হবার সাথে সাথে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি যা দানা বেঁধে উঠেছিল পালেদের সময়ে, তার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাঁদের মুখের এবং সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত, কৌলিন্যের জীবন্ত প্রতীক। সেন রাজদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষার প্রচার এবং প্রসার সাধন। সেনেদের সময়ে সংস্কৃত ভাষা যে শুধু রাজভাষার মর্যাদালাভ করেছিল তাই নয়, সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা চর্চার নানা বাধা নিষেধ আরোপিত হয়েছিল। বাঙলা ভাষায় ধর্ম-সাহিত্য চর্চার ব্যাপারে এক কঠোর নির্দেশ ঘোষিত হয়ঃ-

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাসায়াং মানবঃ শ্রুতাঃ
রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।"

অর্থাৎ 'যদি কেউ অষ্টাদশ পুরাণ বা রামায়ণ বাঙলা ভাষায় শ্রবণ করে, তাহলে সে রৌরব নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।' মধ্যযুগে রাষ্ট্র শাসন সংস্থা সাহিত্য-সংস্কৃতি-চর্চার ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতো। কাজেই তৎকালীন কোন শাসন ব্যবস্থা যদি একটি ভাষাকে পঙ্গু করে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে মধ্যযুগের পরিমণ্ডলে বসে কবি-শিল্পীদের পক্ষে সে ভাষায় সাহিত্য চর্চা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই সেনেদের সময়ে আমরা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখিনা, ফলে পালেদের শাসনকালে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যে ধারাটি অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, বহিরাগত সেনেদের আমলে উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে অঙ্কুরেই তার বিলুপ্তি ঘটে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এনামুল হক সাহবের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"বাংলার শেষ হিন্দু রাজা না হইলেও অন্ততঃ সমগ্র বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। তাঁহার সভায় ধোয়ী, জয়দেব, উমাপতিধর প্রভৃতি কবি এবং হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নানা পণ্ডিত ও কবির সমাবেশে তাঁহার রাজধানীতে যে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়িয়া ওঠে, তাহা জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দের' মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেও, বাংলা-ভাষা চর্চার কোন আয়োজন তথায় ছিল না।"[২২]

সেনেরা এ দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন পাল রাজাদের কাছ থেকে। এতে পালেরা স্বাধীনতা হারানোর বেদনা অনুভব করবে এটি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।



পালেরা সেনদেরকে যেমন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি, অন্যদিকে সেনেরাও পালেদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি, ফলে দীর্ঘদিন ধরে পাল এবং সেনেদের মধ্যে অবিশ্বাস, বিরোধ, হিংসা, বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকে। এই সময় পালেরা তাদের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাতে থাকে এমন যুক্তির সমর্থনে আমরা উল্লেখ করতে পারি,-"এই সময়ে হিন্দু সমাজে বৌদ্ধগণ বেদ বিরোধী বলিয়া বিশেষভাবে নিন্দিত হইত। ঐরূপ রাষ্ট্রিক সঙ্কটের সময়ে এই সধর্মীগণ কোন পথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহাও বিবেচ্য। লামা তারানাথের মতে এই সময়ে বৌদ্ধগণ নাকি ইখতিয়ারের গুপ্তচরের কার্য করিয়াছিল। কথাটা অমুলক নাও হইতে পারে।"[২৩]

কিন্তু পালেদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সেনেরা অত্যন্ত সজাগ ছিলেন, ফলে পালেদের চেষ্টা খুব সহজে ফলপ্রসু হয় নি, তবে সেন এবং পালেদের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই মারাত্মক আকার ধারণ করতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের প্রতিরোধ আন্দোলনে অবশেষে পালেরা যখন হেরে গেলেন তখন তাঁদের উপর শুরু হোল অকথ্য অত্যাচার আর নির্যাতন। সেনেদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তাঁদের প্রিয় জীবন, মান-সম্মান, ধর্ম-সংস্কৃতি, সাহিত্য-ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তাঁরা নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে যেতে শুরু করেন। পালেরা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। আজও যে সমস্ত বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায় সম্ভবতঃ সেগুলো সেনেদের দ্বারা সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক দেবেন্দ্র কুমার ঘোষের বক্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "পাল বংশের পরে এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার অতিশয় ব্যাপক হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশুস্ক হইয়া পড়ে। সেন বংশের রাজারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মী, তাহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে রাজা ও রাষ্ট্র উভয়েই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিমুখ হইলে বাঙ্গলার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙ্গালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যোজাত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার বাইরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাঙ্গালা গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।"[২৪]

অধ্যাপক দেবেন্দ্রকুমার ঘোষের এ উক্তি যে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল 'চর্যাপদ' গ্রন্থটির আবিস্কারের ঘটনাই তার বড় প্রমাণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদ গ্রন্থটি উদ্ধার করেন নেপালের রাজদরবার থেকে। কাজেই তুর্কী আক্রমনের ফলে বাঙালীর বিদ্যা ও সাহিত্য চর্চার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল; সুকুমার সেন এই মন্তব্য

তুর্কীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে সেনেদের প্রতি প্রয়োগ করলে বোধ করি অনেকটা যুক্তি সঙ্গত হোত। সেন শাসকদের ষড়যন্ত্রের ফলে তুর্কীদের আগমনের আগেই বাঙালা সাহিত্য চর্চার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং বাঙলা সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত যদি কেউ করে থাকেন তাঁরা সেন শাসক বৃন্দ। সেন শাসন কালে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চাকে কি ভাবে কোন ঠাঁসা করে রাখা হয় শ্রদ্ধেয় দীনেশ সেনের উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে,- "জনসাধারণ পালদের সময় নতুন গ্রাম্য গীতি রচনা করিত, রূপ-কথা, গীতি কথা প্রভৃতি বাঙলা ভাষায় রচিত হইত এবং রাজারা তাহা শুনিতেন। কিন্ত সেনদের সময় কি সাধ্য যে জনসাধারণ বাঙলা গান লইয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করে?"[২৫]

দীনেশ বাবুর উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পাল শাসনকালে দেশে লৌকিক ভাবধারা বেশ খানিকটা প্রশ্রয় পেয়েছিল এবং এই প্রশ্রয়ের মূল কারণ বৌদ্ধরা সমাজের সাধারণ মানুষকে প্রাকৃতজন বলে দূরে ঠেলে ফেলে দিতে বা ঘৃণা করতে পারেন নি এবং সে কারণেই প্রাকৃতজনদের ভাষা ও সাহিত্যকে তারা অবজ্ঞা করেন নি। কিন্তু সেন বংশীয়দের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ সাহিত্য ও সংস্কৃতির গণ্ডী থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে যায়। সেনেদের সময় সাহিত্য সৃষ্টিতে একদিকে যেমন সংস্কৃত ভাষা, বাঙলা ভাষার উর্দ্ধে স্থান পায়, অন্যদিকে দেশে ব্রাহ্মণ্যে সংস্কৃতি সর্বপ্রযত্নে বর্দ্ধিত হবার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে নেয়। এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচণ্ড চাপে পালেদের সময়ে গড়ে ওঠা লৌকিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাথায় বাজ পড়ে। সেন রাজদের চক্রান্তের ফলে বাঙলা সাহিত্যের গতি হয়ে যায় রুদ্ধ। কাজেই দেখা যাচ্ছে পালরাজদের দ্বারা কর্ষিত বাঙলা সাহিত্যের উর্বর ভূমিটি সেনদের আমলে কর্ষণের অভাবে অনুর্বর মরুভূমিতে পরিণত হয়। তুর্কীরা এসে সেই নিষ্প্রাণ অনুর্বর মরুভূমির বুকে জল সেচনের ব্যবস্থা করে তাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। তুর্কীদের আগমনের ফলে বাঙালী জাতি এবং তার সাহিত্য শুধুমাত্র যে চরম দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে-তাই নয়, তুর্কীদের সান্নিধ্যে বাঙালী জাতি এক নতুন সংস্কৃতির স্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সাংস্কৃতিক বিকাশের এক নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে। অবশ্য এতে সময় লেগেছে বেশ খানিকটা।

ভালো ফসল ফলাতে হলে প্রয়োজন উর্বরা ভূমির। কিন্তু উর্বরা ভূমি আপনা থেকেই গড়ে ওঠে না, তাকে বিশেষ যত্নের সাথে কর্ষণের মাধ্যমে উর্বরা করে তুলতে হয়। আবার অনেক সময় উপযুক্ত কর্ষণের অভাবে উর্বর ভূমিও কালে অনুর্বর মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে। উপমাটি সেন শাসন ব্যবস্থার কালে বাঙলা সাহিত্যের অবস্থার



সাথে বিশেষভাবে খাপ খায়। পালেদের কঠোর সাধানায় গড়ে ওঠা বাঙলা সাহিত্যের উর্বর ভূমি সেনদের আমলে উপযুক্ত পরিচর্যা বা কর্ষণের অভাবে সৃজনী শক্তি একেবারে হারিয়েফেলে। তুর্কীরা এসে গভীর সহানুভূতির সাথে বাঙলার মানুষের মৃতপ্রায় সাহিত্যকে আবার জীবন্ত করে তোলে। কাজেই ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীকে বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ না বলে তাকে বাঙলা সাহিত্যের নবচেতনার উন্মেষ কাল বলে চিহ্নিত করাই বোধ করি অধিক যুক্তি সঙ্গত। এই উন্মেষকালে যদি বাঙলা ভাষায় রচিত সার্থক সাহিত্যের কোন রকম সন্ধান না মেলে তা হলে এর জন্য তুর্কীদেরকে দায়ী না করে সেন শাসনকে দায়ী করলেই বোধ করি অধিক যুক্তি সঙ্গত হবে।

সাহিত্যে অন্ধকার যুগ। ভাবতে একটু বিস্ময় লাগে বৈ কি! যে যুগে প্রাণবন্ত মানুষ আছে, মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে, সুকুমার প্রবৃত্তি আছে, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম প্রীতি স্নেহ-ভালবাসা আছে, সেখানে কোন রকম সাহিত্য সৃষ্টি হবে না, এ কেমন কথা। মানুষ তার হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কোন গান বা গাথা নিজেদের ভাষায় একেবারেই প্রকাশ করে নি, এমন হতে পারে না। কাজেই সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় 'অন্ধকার যুগের' কোন রকম অস্তিত্ব আছে কি না, সে সম্পর্কে তর্কের অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট।

কিন্তু বাঙলা দেশের ক'জন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ- চতুর্দশ শতককে বাঙলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন এই দুটো শতাব্দীর কোন উল্লেখযোগ্য বাঙলা রচনা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ত্রয়োদশ-চর্তুদশ শতকের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বাঙলা রচনা পাওয়া যায় নি বলেই সে যুগে কিছু রচিত হয় নি, এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে কি? বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে অতি আধুনিককালে। জলো আবহাওয়া মুখরিত বাঙলা দেশে বিংশ শতাব্দীতে বসে ত্রয়োদশ-চর্তুদশ শতাব্দীতে রচিত সাহিত্যের সন্ধান যদি না পাওয়া যায়, তা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, বিশেষ করে আমাদের মত ইতিহাস-চেতনা বিমুখ বাঙালী জাতির পক্ষে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

আজকে তো আমরা ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোন উল্লেখযোগ্য বাঙলা রচনা না পেয়ে তাকে 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত করছি। কিন্তু বসন্ত রঞ্জন বাবু কিছুদিন পূর্বে যদি বাঁকুড়ার এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' পুঁথি খানা আবিষ্কার না করতেন, অথবা নেপালের রাজদরবার থেকে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' মহাশয় চর্যাপদাবলীর পুঁথিখানা খুঁজে না বের করতেন, তাহলে বাঙলা সাহিত্যের এই অন্ধকার যুগ আরও

কতকাল দীর্ঘ হোত, অন্ততঃ পক্ষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এবং চর্যাপদের পুঁথিগুলো যে পাওয়া গেছে, সে নেহায়েৎ আমাদের সৌভাগ্য, আর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর কোন উল্লেখযোগ্য রচনা যে আমাদের হস্তগত হয় নি, সে আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। আধুনিক কালের মত প্রাচীন কালে দেশে না ছিল কোন রকম ছাপাখানা, না ছিল কাগজের ব্যবহার। কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের শিল্প কর্মকে লিখে রাখতেন ভূর্জোয়া অথবা তালের পাতায়। বাঙলা দেশের জলীয় আব-হাওয়ার মধ্যে সেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করা বড় সহজ কথা নয়। কাজেই চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মত কত মূল্যবান পুঁথি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, কে তার খবর রাখে! তা ছাড়া প্রাচীনকালে এমন অনেক কবি ছিলেন তাঁরা লেখা-পড়া জানতেন না, মুখে মুখে তাঁরা গান-কবিতা রচনা করতেন এবং মানুষের মুখে মুখেই সেগুলো দেশময় ছড়িয়ে পড়তো। কিন্তু এই মৌখিক সাহিত্য আর কতদিনই বা টিকে থাকতে পারে! হয়তো কালের আবর্তে মুখে মুখে রচিত সেই সাহিত্য তার নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছে মাঝ পথেই। আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছবার অবকাশই পাইনি। কাজেই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয়নি বলেই সে যুগে কোন রকম সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি, এমন কথা বলা বোধ করি সমীচীন হবে না। কেউ কেউ অনুমান করে থাকেন, তুর্কীদের শাসনামলে কিছু লোক-কাহিনী, ছড়া, ধাঁধা, লোক বিশ্বাস, খনার বচন, প্রবচন ইত্যাদি রচিত হয়ে থাকবে। খনার বচনের সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন,- 'খনার বচন'গুলিও বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের অন্যতম। পরবর্তী যুগে এইগুলির ভাষা পরিবর্তিত এবং এই পরিবর্তিত ভাষায় সংগৃহীত হইলেও, ইহাদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই গুলিতে চাষ-বাস, আবহাওয়া ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট যুগ যুগান্তের অভিজ্ঞতা মুখে মুখে রক্ষিত হইয়াছে।"২৬

ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চর্তুদশ শতককে বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করতে গিয়ে এর জন্য মূলতঃ তুর্কীদের আগমন এবং তাদের শাসন ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন। তুর্কীদের আগমনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাঙলা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ বা বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, এমন কথা ইতিহাস বলে না। তবে তুর্কীদের এ দেশে আগমনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে রাষ্ট্র বিপ্লবের দাবী যাঁরা তুলেছেন, তাঁদের সে দাবী যদি সত্যিও হয়, তাতে সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় কোথায়? রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে দেশের সাহিত্য সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যাবে, এমন কথা মেনে নেয়া যায় কি? সাহিত্য হচ্ছে মননশীল মানুষের ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা-সাধনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই প্রকাশ ক্ষমতা যাঁর মধ্যে থাকবে, জগতের কোন বিরুদ্ধ শক্তিই তাঁর সেই প্রকাশ

DONATED BY
DR. M... D SHAH
OUR ... .MILY



ক্ষমতাকে রুদ্ধ করে দিতে পারবে না। ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার বিপ্লব, প্রথম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, চীনের বিপ্লব, পলাশীর যুদ্ধ, ভিয়েতনাম, বাঙলা দেশের মুক্তি সংগ্রাম তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের মুহূর্তেও তো দেশের সাহিত্য চর্চা একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায় নি।

ফাঁসীর মঞ্চে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ সাহিত্য রচনা করেছে, কঠিন কারাবাসে বসে, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কবি তাঁর ব্যাথা-বেদনার গান গেয়ে গেছেন, আর তুর্কীদের আগমনে দেশে এমন কি বিপ্লব শুরু হয়েছিল যার ফলে দেশের কবি শিল্পীরা একেবারে বোবা বনে গিয়েছিলেন? তা ছাড়া প্রাচীনকালের যুদ্ধ বিগ্রহের সাথে আজকের দিনের যুদ্ধ বিগ্রহের আকাশ পাতাল পার্থক্য। প্রাচীনকালের এমন ঘটনাও শোনা যায় যে, রাজায় রাজায় যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে, তখন গ্রামবাসীগণ নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নিয়ে দিন যাপন করেছে। রাজনৈতিক বিবর্তন গ্রামকে তেমনভাবে স্পর্শ করে নি। আর রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ হলেও তো কবি শিল্পীদের সাহিত্য সৃষ্টিতে অসুবিধা হবার কথা নয়। সেই যুদ্ধ বিগ্রহের ছবিও তো কবি- শিল্পীরা তাঁদের রচনায় তুলে ধরতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, আগের দিনের কবি-শিল্পীরা যথেষ্ট পরিমান সমাজ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু এই যুক্তি খণ্ডনের জন্য 'ঢেনঢন পাদের' একটি পদই যথেষ্ট-

"টিলাতে মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাঁড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।।
বেঙ সংসার বড়হিল জাঅ
দুর্ধিল দুধু কি বেন্টে সমাঅ।"

অর্থাৎ "টিলাতে আমার ঘর, নেই প্রতিবেশী, হাঁড়িতে নেই ভাত, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, ব্যাঙের ছাতার মত সংসারে সন্তান শুধু বেড়েই চলেছে।" দেশের এমন কঠোর বাস্তব জীবনের ছবি যদি একজন প্রাচীনকালের কবির হাতে চিত্রিত হতে পারে তাহলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোন কবি তাঁর নিজের দেশ এবং সমাজের ছবি কিছুই লিপিবদ্ধ করে রেখে যেতে পারেন নি, এমন কথা আমরা নিশ্চিয় করে বলতে পারি কি?

আরেকটি মজার কথা এই যে, যে সমস্ত ঐতিহাসিকবৃন্দ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতককে তুর্কীদের আগমন এবং তাঁদের সাথে নানা রকম যুদ্ধ বিগ্রহের ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলা সাহিত্য অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন, তারাই আবার মাঝে মাঝে বলে থাকেন এই যুগে বেশ কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বাঙলা

দেশে তুর্কীদের আগমন যদি সত্যি বাঙলা সাহিত্য চর্চার মূলে কুঠারাঘাত করে থাকে, তাহলে সে কুঠার সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চার মূলেও আঘাত হানবার কথা। কিন্তু সমালোচকেরা তেমন কথার উল্লেখ করেন নি। অথচ আমরা জানি তুর্কীরা এ দেশের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন সেনেদের কাছ থেকে। সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাঁদের ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং এবং তাঁদেরই পৃষ্টপোষকতায় দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। যখন একটি বিদেশী শক্তি নতুন কোন দেশ দখল করে, ক্ষমতাচ্যুত শক্তিকে সে কখনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ দেয় না। ক্ষমতাচ্যুত শক্তি একটু সুযোগ পেলেই আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চাইবে, এ সত্যটি মনে রেখে সব সময় বিজয়ী শক্তি নানা কলা-কৌশলে বিজিত শক্তিকে দুর্বল এবং বীর্যহীন করে রাখতে চায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এ ক্ষেত্রে পাল এবং সেনদের কথা বলতে পারি।

সেনেরা পালেদের কাছ থেকে বাঙলা দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের সাথে পালেদের প্রতি শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার আর নির্যাতন। পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাঙলা দেশের শাসন ক্ষমতা সেনেদের হাতে চলে যাবার সাথে সাথে পালেদের অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে ওঠে তার একটি জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান সাহেবের বক্তব্যে,-

"The evidence indicates that after any major change in political power, religious persecutions tended to follow presumably to stamp out allegiance to the new. In some instances the old literature was suppressed and actively discouraged for the same reason. Scholars believe, for example, that when the Sena dynasty succeeded the Pala kings, Buddhists were put to the sword."[২৭]

সেনেদের শাসন ক্ষমতা পালেদের জীবনকে কতখানি দুর্বিসহ করে তুলেছিল তার প্রমাণ মেলে দীনেশ বাবুর বক্তব্যেঃ-

"Many of the chief princes, professing the wicked doctrines of the Buddhist and the Jaina religions, were vanquished in various scholarly controversies. Their heads



were then cut off with axes, thrown into mortars and broken to pieces (Reduced to powder) by means of pestles."[২৮]

যে রাজনৈতিক কারণে সেনেরা পালেদের প্রতি দমনমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, যুক্তির দিক থেকে তুর্কীরাও সেনেদের প্রতি সে ধরণের দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকতে পারেন, কেননা তুর্কীরা দেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন সেনেদের কাছ থেকে। কাজেই তুর্কীদের সাথে সংঘর্ষ বাধবার কথা সেনেদের। সেনেদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। অথচ তুর্কীরা তাঁদের প্রতিপক্ষ সেনেদের ভাষায় আঘাত না হেনে বাঙলা সাহিত্য চর্চার পথকে রুদ্ধ করেছেন, এমন কথা ভাবতে আমাদের মনে নানা রকম প্রশ্ন দেখা দেয় বৈ কি? এ সমস্ত ঘটনা থেকে আমাদের অনুমান করতে বাধা নেই 'অন্ধকার যুগ' বলে যে দুটো শতাব্দীকে ঐতিহাসিকবৃন্দ চিহ্নিত করেছেন, আসলে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, আলোকাজ্জ্বল। তুর্কীরা যখন সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার কোন রকম ব্যাঘাত ঘটাননি, তখন বাঙলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও কোন রকম বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করেন নি। ঐ সময় সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার সাথে সাথে বাংলা সাহিত্য চর্চাও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। আধুনিক কালের গবেষণা সে সব সাহিত্যের কিছু উদাহরণও তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। আমরা সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদকেই ধরা হয়। চর্যাপদে ধৃত ভাষা সমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে চর্যার বৈশিষ্ট্যময় অপভ্রংশ তুর্কী আমলে এসে আরও বেশী মাত্রার বাঙলা হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ এনামুল হক সাহেবের অভিমত,-

"এই কথা সহজে অনুমান করা যায় যে, চর্চার বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যময় অপভ্রংশ তুর্কী আমলে আসিয়া আরও বেশী মাত্রায় বাংলা হইয়া উঠিয়াছে। এমন ভাষার কয়েকটি নমুনা 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামক অপভ্রংশ ভাষায় রচিত গীতি কবিতার সঙ্কলনটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যই খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষার অনুরূপ ভাষায় যে কয়টি নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেগুলি বাংলা দেশেই রচিত হইয়া থাকিবে এবং সেগুলির রচনাকালও তুর্কী আমলের একেবারে গোড়ার দিককার বলিয়া মনে হয়, কারণ এগুলির সহিত চর্যাপদগুলির ভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ট।"[২৯]

এরপর আমরা 'শেক শুভোদয়া' নামক গ্রন্থটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। যদিও এটি সংস্কৃত গ্রন্থ, কিন্তু এই সংস্কৃত গদ্যের মূল কাঠামো এবং বাক-ভঙ্গী

বেশ কিছুটা বাঙলা। 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থটির রচনাকাল নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ এনামুল হক সাহেব বলেছেন,- "শেক শুভোদয়া খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিককার রচনা।"৩০

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা রামাই পণ্ডিতের 'শূণ্যপুরাণের' অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুস্মা' শীর্ষক কবিতাটি। রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাবকাল এবং রচনার পর্যায় নিয়ে নানা রকম তর্ক বির্তক থাকলেও তাঁর রচনার প্রথম পর্যায় যে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত এ সম্পর্কে অনেকেই একমত। 'নিরঞ্জনের রুস্মা' নামক অংশটির আভ্যন্তরীণ বিষয় বস্তুও স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, তুর্কীদের কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পরের ঘটনাই সেখানেই বিবৃত হয়েছে এবং সেদিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে একে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা বলে অনুমান করা যেতে পারে।

যাহোক, তুর্কী বিজয়ের প্রথম দিকের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বাঙলা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে সময় কোন রকম সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি। বাঙলা দেশের জলোআবহাওয়া, উঁই, ইঁদুর, পোকা মাকড়ের উপদ্রব, কাগজ-পত্রের অভাব এবং ঐতিহাসিক অসচেতনতাই বোধ করি তখনকার সৃষ্ট সাহিত্য না পাবার মূল কারণ। তবে এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই, সেনেদের বৈরীতার জন্য বাঙলা সাহিত্য চর্চায় যে বিপর্যয় ঘটে, তাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতেই সমগ্র ত্রয়োদশ শতাব্দী কেটে যায়। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সুলতান 'শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাঙলা দেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, দেশ ফিরে পায় এক শান্ত সুস্থ পরিবেশ। এই সুস্থ পরিবেশে দেশে সাহিত্য চর্চা বৃদ্ধি পাবে, এমনটি অনুমান করা বোধ করি অযৌক্তিক হবে না। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এর লিপিকাল এবং ভাষা বিচার প্রসঙ্গে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুনীত বাবু একে (১৩৫০-১৪০০) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত গ্রন্থ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের পরেই কবি হিসেবে আমরা নাম করতে পারি 'বড়ু চণ্ডী দাসের।' সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করে চণ্ডীদাস বাঙলা ভাষাকেই তাঁর রচনার বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছেন, কারণ এই সময় মুসলমানদের আগমনে দেশে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ক্ষুণ্ন হয় এবং বাঙলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার পথ সুগম হয়ে ওঠে।

আমরা যদি চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো চর্যাপদের ভাষা বাঙলা কিনা তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণার মাধ্যমে মত প্রকাশ করেছেন চর্যাপদ বাঙলা ভাষার রচনা। সাধারণ পাঠক একে বাঙলা বলে অনুমান করতে পারবে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা সম্পর্কে এমন



কোন প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে না। যে কোন সাধারণ পাঠকও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পাঠ করে বুঝতে পারে এটি বাঙলা ভাষায় রচিত। চর্যাপদের সাথে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা গত এই যে বিরাট পার্থক্য, এটি কেমন করে সম্ভব হোল? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা চর্যাপদের ভাষার যে বিবর্তিত রূপ পেয়েছি, ভাষা চর্চা ছাড়া এই বিবর্তন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। পাশাপাশি দুটো উদাহরণ তুলে ধরলেই আমার এ বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। চর্যার একটি পদঃ-

"তিশরণ ণাবী কি অ অঠকমারী।
ণিঅ দেহ করুণা শূণ মেহেরী।।
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুণিআ।।

এই পদটি আদৌ বাঙলা ভাষায় রচিত কি না, তা নিয়ে গবেষণা চলতে, বিতর্ক হতে পারে। সাধারণ পাঠকের কাছে চর্যাপদ দুবোর্ধ্য। পণ্ডিতেরা যখন বুঝিয়ে দেন তখন সাধারণ পাঠক বুঝতে সমর্থ হন, এটি বাঙলা ভাষায় রচিত। তা ছাড়া বুঝবার কোন পথ নেই। পাশাপাশি আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য গ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ তুলে ধরতে পারি-

"কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মোর আউলাইলোঁ রান্ধন।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই পদ যে বাঙলা ভাষায় রচিত, সাধারণ পাঠকেরও তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কাজেই চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য চর্চা যথারীতি চলেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বিবর্তিত রূপ তার সাক্ষ্য বহন করে। ভাষার বিবর্তন রাতারাতি গজিয়ে উঠতে পারে না। চর্যাপদের পর ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা না হলে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাঙলা ভাষার এই সহজ সরল রূপ পেতাম না। এ প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মুলবান কথা বলেছেন,-

"চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী আরও একটি ভাষা স্তর ছিল, যাহার কোন সাহিত্যিক বা ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাপদে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুধু এই

একখানা সঙ্কলন গ্রন্থে বন্দী হইয়া থাকিল, তাহার আর বিকাশ হইল না- ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী স্তরেও বাংলা ভাষা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল- শুধু তাহার কোন নিদর্শন সংগ্রহ করা যায় নাই।"[৩১]

এর পর আসে মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গ। মঙ্গলকাব্যে যে সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়, সে সব লৌকিক দেব-দেবীর ধারণা বাঙলা সাহিত্যে আলাউদ্দিনের প্রদীপের মত হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠে নি। এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, উদ্ভব এবং বিকাশের নিশ্চয়ই একটি সুশৃঙ্খল ধারা আছে। যার ফলে কেউ কেউ অনুমান করে থাকেন,- "নাথ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গোপীচন্দ্রের গল্প-কাহিনী, নাথ গুরু গোরক্ষ নাথের অলৌকিক আখ্যান, মঙ্গল কাব্যের আদিম স্তর চণ্ডী, মনসা, ধর্মমঙ্গলের পাঁচালী আকারের অপরিণত রূপ প্রভৃতি এইকালে রচিত হইয়া থাকিবে।"[৩২]

নেপাল থেকে প্রাপ্ত কতগুলো সিদ্ধাচার্যের নাম থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের পরেও দেশে চর্যা সাহিত্যের ক্ষীণ ধারাটি প্রচলিত ছিল। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ২৪/৪/৬৩ তারিখের খবরে দেখা যায়-"পাশ্চত্যের একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত বিজ্ঞানী ঘটনাক্রমে প্রাচীন বাংলা ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কয়েকটি নেপালী লোক-গীতি আবিস্কার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি প্রাচীন যুগের উপর নতুন আলোকপাত করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"[৩৩] ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত এই নব আবিষ্কৃত লোক-গীতিকাগুলো নিয়ে কিছুকাল গবেষণা করেছেন। এগুলোর নাম করণ করা হয়েছে 'চা-চা' গীতি। ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্তের 'চা-চা' গীতি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্ধকার যুগের উপর কিছু নতুন আলোকপাত করতে পারে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত সময়ের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রচনা পাওয়া যায়নি সত্য, কিন্তু তাই বলে এই সময়ে কোন রকম সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্য বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য, "এই সময়ে মানুষ তাহার সুখ-দুঃখের কোন গান বা গাথা নিজেদের ভাষায় একেবারেই প্রকাশ করে নাই, এমন হইতে পারে না।"[৩৪] কাজেই বাংলা সাহিত্যের কথিত 'অন্ধকার যুগের' অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন।*

---

* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা *সাহিত্যিকী*-র বসন্ত, ১৩৭৯ ও শরৎ ১৩৮০ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।



## নির্দেশপঞ্জী


১। *প্রাচীন কাব্যঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ।* ক্ষেত্র গুপ্ত-পৃঃ ১

২। সমগ্রন্থ। পৃঃ ২

৩। *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকাঃ* (পথম সংস্করণ) ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ২৭

৪। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃ* প্রথম সংস্করণঃ শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ২৪-২৫

৫। *বাংলা সাহিত্যের কথা ঃ* প্রথম সংস্করণঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। পৃঃ ৪

৬। *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখাঃ* তৃতীয় সংস্করণঃ গোপাল হালদার। পৃঃ ৩৯

৭। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারাঃ* প্রথম সংস্করণঃ শ্রী শ্রীকুমার বন্ধ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৯

৮। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসঃ* (প্রথম খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ ডঃ সুকুমার সেন- পৃঃ ৫৯

৯। *The Muslim Rule in India: Kartm.* পৃঃ ৩৫

১০। *প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালীঃ* শ্রীক্ত সুকুমার সেন- পৃঃ ২৩

১১। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগঃ* অরবিন্দ পোদ্দার- পৃঃ ২০

১২। *History of Bengal* প্রথম খণ্ডঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত- পৃঃ ৬১৮

১৩। *প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীঃ* শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন- পৃঃ ২৬

১৪। *সমগ্রন্থ-* পৃঃ ২৮

১৫। *মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগঃ* অরবিন্দ পোদ্দারঃ পৃঃ ৬৬

১৬। *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্যঃ* ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকঃ পৃঃ ২৩-২৪

১৭। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসঃ* (প্রথম খণ্ড) শ্রীসুকুমার সেন - পৃঃ ৫৯

১৮। *সমগ্রন্থ-*পৃঃ ৫৯

১৯। *আল্‌বারুণীঃ* ভারতবর্ষ ১ম খণ্ড - পৃঃ ২৬

২০। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ* শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- পৃঃ ৩৫

২১। *সমগ্রন্থ-* পৃঃ ৩৬

২২। *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্যঃ* ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ঃ পৃঃ ১২

২৩। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃ* শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ পৃঃ ২৭

২৪। *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাসঃ* শ্রীদেবেন্দ্র কুমার ঘোষঃ পৃঃ ৯-১০

২৫। *বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যঃ* ৬ঃ দীনেশ চন্দ্র সেন- পৃঃ ৩৮

২৬। *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্যঃ* ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক পৃঃ ২৮

২৭। *The Emergence and Development of Dobhast Literature in Bengal:* Dr. Qazi Abdul Mannan. Page-1

২৮। *Htstory of Bengalt Language and Litterature:* D.C. Sen. Page-6

২৯। *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্যঃ* ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকঃ পৃঃ ২৫-২৬

৩০। সমগ্রন্থঃ পৃঃ ২৭

৩১। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃ* শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- পৃঃ ১৩৭

৩২। সমগ্রন্থ- পৃঃ ১৩৮

৩৩। *দৈনিক ইত্তেফাক-ঢাকা* ২৪/৪/৬৩- পৃঃ ৬

৩৪। *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্যঃ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক- পৃঃ ২৩*

# বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার ইতিহাস রচনার প্রাসঙ্গিক সমস্যা ও প্রত্যাশা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

জীবনানন্দ দাশ তার 'সমারূঢ়' কবিতায় ইয়েটসের 'দি স্কালার' কবিতার অনুসরণে লিখেছিলেন ঃ

"বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা-"
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিন্ড দিল না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়-সে যে আরূঢ় ভণিতা
পান্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
বসে আছে সিংহাসনে-কবি নয়-অজর অক্ষর
অধ্যাপক, দাঁত নেই- চোখে তার অক্ষম পিচুটিঃ
বেতন হাজার টাকা মতো- আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের ঝোঁক
চেয়েছিলো হাঙরের চেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

কাব্যবোধহীন কাব্যসমালোচকের উদ্দেশে এই উচ্চারণ কাব্যবোধহীন কবিতার ইতিহাস লেখকের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

কবির দায়বদ্ধতা থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন ঃ

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার ওপরে জ্বলিছেন ববি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো-যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।

[ আমার কৈফিয়ৎ, সর্বহারা, *নজরুল রচনাবলী*-১, নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা মে ১৯৯৩, পৃ. ২৯৫]

নজরুলের এই দায়বদ্ধতা সমকালীন সমালোচকদের, এমনকি অধিকাংশ কবি-সমালোচকদের ছিল না। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস রচয়িতাদের ক্ষেত্রেও প্রায়শই কবিমানস উপলব্ধির অক্ষমতাই প্রকট।

'Erigo monumentum aere perennius' -তাঁর কবিতার মনুমেন্ট রোমের সকল তাম্র-মূর্তির চেয়ে স্থায়ী হবে-হোরেসের এই সগর্ব উচ্চারণ সকল প্রকৃত সৃজনশীল মানুষের অমরত্বের অভিলাষ প্রতীক।

কবিতা যেহেতু মহত্তম শিল্পকর্ম সেহেতু কবিতার ইতিহাস রচনা কাব্যবোধহীন কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে ইতিহাস শুধুই তথ্যপঞ্জী নয়; তথ্যপঞ্জী ইতিহাসের উপাদান। কালের কিংবদন্তীতে বা সমকালের সাংবাদিক প্রচারণায় নির্ভর না করে, তথ্য সাজিয়ে সত্যে উপনীত হওয়াই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব।

সাহিত্য মানবিক সৃজনশীলতার উৎকর্ষের ফসল তাই সাহিত্যের ইতিহাসে একদিকে যেমন তথ্যপঞ্জীর কালানুক্রমনের গুরুত্ব রয়েছে তেমনি রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনশীলতার উৎকর্ষের স্তরচিহ্নিত তাৎপর্যের বিশ্লেষণ। সাহিত্য ইতিহাসের মধ্যে কবিতার ইতিহাস স্বভাবতই গভীরতর ব্যঞ্জনাসন্ধানী।

কবিতার ইতিহাস তথা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার আগে ইতিহাস-চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রয়োজন। আমাদের দেশে যেহেতু আধুনিক ইতিহাস-চর্চা প্রধানতঃ ইউরোপনির্ভর সেহেতু ইউরোপের ইতিহাস-চর্চার পরিবর্তনের ধারা ও সাম্প্রতিক প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি।

মৃত ও বিলুপ্ত অতীত নিয়েই ঐতিহাসিকের মূখ্য বিবেচনা। আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা যেন তার দায়িত্বের এলাকার বাইরের ব্যাপার।

তবু এত সরলরৈখিক নয় সব কিছু। ঐতিহাসিক সবসময়ই এমন সব ইতিহাসের তথ্যের মুখোমুখি হন যা অতীতের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের ভবিষ্যৎমুখী চিন্তাচেতনার কথা বলে। ঐতিহাসিকের বর্ণনায় তাই ফুটে উঠে ঐসব আশার পরিপূর্ণতা বা অপূর্ণতা, অতীতের আশা ও প্রকৃত ফলের মধ্যের ব্যবধান। ইতিহাস এক অর্থে মানবিক আশার কাহিনী এবং এই মানবিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক যথার্থই ওয়াকিবহাল। আমাদের আশা-প্রত্যাশা বাস্তবায়নের কোন কথা তাঁরা বলতে পারেন না বটে, তবে তাঁরা বলতে পারেন অতীতের আশার কল্পনা ও পরিনাম।



ইউরোপে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে ইতিহাস দৈনন্দিন জীবনেরই অংশ ছিলঃ ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল ইতিহাস অনুমোদিত। যা কিছু অতীতের তাই ছিল ভাল; জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বহমানতা। মানুষ যেন তাদের পিতৃ পিতামহের অনুরূপ জীবনযাপন করুক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের ভূমিকা ছিল বর্তমান কালের জন্য আদর্শায়িত মডেল উপস্থাপন। এটা সম্ভব হয়েছিল বহু অভিজ্ঞতার অপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। মানুষ যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবত- আনন্দ, পরিত্রান অথবা জীবনের মানে-তা ভবিষ্যতে বা সমকালের প্রবাহে নয়, সন্ধানযোগ্য ছিল অনন্ত জীবনপ্রবাহের ধারায়। তাই আশা ছিল যেন স্বতস্ফূর্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্যায়ের ও উনবিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক অভিঘাত অনেক প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন আনে। কালজীর্ণ প্রাচীনকে সরিয়ে স্থান করে নেয় নব্য নাগরিকদের বিল্পবস্পৃষ্ট জীবন; শ্রম বিভাজন, আমলাতান্ত্রিকতার বিকাশ এবং আরো নানা পরিবর্তন। বস্তুতপক্ষে স্থায়িত্বের বদলে পরিবর্তনই তখন কালের বাণীবহ হল। অতীত তাই আর জীবন্ত ঐতিহ্য নয় বরং গণ্য হল উত্তীর্ণ কালের ইতিহাসের অংশ হিসেবে।

বিশ্বকে যদি ঐতিহাসিক ধারাক্রমের এক ফসল মনে করা যায় তবে একথা সত্য যে তার পরিবেশ পরিবর্তনের ক্ষমতা মানুষের হাতে। তার-আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন কালস্রোতে নয় বর্তমানেই সম্ভব। তাই অতীতের কথা বলে ইতিহাস ভবিষ্যতেরই পথ দেখায়। নিজের জীবনে না হলেও সন্তানের জীবনে পরিবর্তন আসবে এই বিশ্বাস থেকে মানুষ বর্তমানের কর্মকান্ডকে পরিচালনা শুরু করে। ইতিহাস ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রেরণার উৎস হয়ে উঠল। বিপ্লবী ও সংস্কারক উভয়ই স্ব স্ব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রেরণা হিসেবে অতীতকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। প্রগতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদির স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন ইতিহাস থেকে। রক্ষণশীল চিন্তাবিদরাও স্থিতাবস্থার সপক্ষে হাজির করলেন ইতিহাসের সাক্ষ্য। মানবিক কার্যাবলী অতীতের নিরিখে নতুনভাবে নির্দেশিত হল। ইতিহাস মানবজীবনে এভাবেই হয়ে উঠল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতি, রাজনৈতিক দলসমূহ, সামাজিক শ্রেণীসমূহ, বিজ্ঞানী, শিল্পী সবাই ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেন এবং আপন আপন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইতিহাসকে ব্যবহার করতে থাকলেন। অনিবার্যভাবে ইতিহাস হয়ে উঠল আদর্শের সংঘাতের ক্ষেত্রভূমি। মানুষ বর্তমানে যা শুনতে চায় তাই সে অতীত থেকে পড়তে লাগল।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপে এইসব ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। ইউরোপে আজ যে তথাকথিত 'উত্তর-আধুনিকতা'র ঢেউ উঠেছে তার মর্মবাণী হচ্ছে 'ভবিষ্যৎহীনতা'; 'নো ফিউচার'। সমকালের সব কিছুই যেন আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের মধ্যে দোদুল্যমান। বিংশ শতাব্দীর দুই বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের বিশেষত জার্মানীর জাতিভিত্তিক ইতিহাসে অবিশ্বাস এনেছে। একালের বহুমাত্রিক সমাজ আপেক্ষিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এই আপেক্ষিকতা যেন শাশ্বত মূল্যবোধ ও স্থায়ী উদ্দেশ্যের সকল ধারণা বিধ্বংসী। জীবন এত দ্রুতগতিতে চলমান যে একালের মানুষ যেন ইতিহাসকে পেছনে ফেলে ছুটে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের ঘটনাবলীর পরিণাম এই। এখন আর বর্তমানকে বদলে দেয়ার প্রেরণা হিসেবে ইতিহাসকে দেখা হচ্ছে না। আজকের রাজনীতিতে দিক নির্দেশনার ইতিহাস ভিত্তি প্রায় অনুপস্থিত। জার্মানরা যদি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের কথা ভাবে তবে তাদের জন্যে আর অনুপ্রেরণার কিছু থাকে না। জার্মানীর আজকের প্রজন্মের লক্ষ্য তাই অতীতকে মুছে ফেলার- সেই সঙ্গে বিশ্বকে বদলে ফেলার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'উত্তর-আধুনিকতা'-তত্ত্বে তাই ভবিষ্যৎ-হীনতা অর্থাৎ ইতিহাসে ভবিষ্যতের কোন দিক নির্দেশনা নেই-এই ধারণাই সুপ্ত রয়েছে।

বলাবাহুল্য এই তথাকথিত 'উত্তর আধুনিকতা'র ধারণা ইউরোপ-আমেরিকা হয়ে আমাদের তরুণদের একাংশে ছায়া ফেলেছে। এই ধারণার মূল সন্ধান না করে তারা 'নুতন কিছু' মনে করে এর দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে অনুকারী প্রচারকে পরিণত হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক চেতনা প্রতিষ্ঠার ইতিবাচক সংগ্রামের বিপরীতে যাদের অবস্থান অর্থাৎ যারা সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি এবং ঐ শক্তির ধারক-বাহক তাদের অবস্থা হিটলারের নাৎসী জার্মানীর ধারক আজকের নব্যনাৎসীদের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে এবং তাদের জন্য এই অর্থে 'উত্তর আধুনিকতার' ভবিষ্যৎহীনতার তত্ত্ব খুবই যথাযথ ও সুসঙ্গত। কেননা যথার্থই তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং তাদের কলঙ্কিত অতীতে কোন ভবিষ্যতের প্রেরণা নেই। নব্য জার্মানীর অনুকরণে তারা 'কন্‌টেক্সট' ছাড়া 'টেক্‌স্ট' বিচারের মানসিক ব্যায়ামে লিপ্ত হতে পারে কিন্তু সৃজনশীলতার স্পর্শরহিত, অতীত ও ভবিষ্যতের সংযোগবিহীন বর্তমানেই অবসিত ঐ বর্তমান-চর্চা এক ধরণের বিলাসী প্রতিক্রিয়াশীলতার অতিরিক্ত কিছু নয়।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার ইতিহাস লেখকের মূল সমস্যা তাই বোধেরও দৃষ্টিভঙ্গির। তিনি কবি না-ও হতে পারেন তবে তাঁর কাব্যবোধ অবশ্যই থাকতে হবে আর



সেই সঙ্গে থাকতে হবে ইতিহাসের ধারাক্রমে কাব্যের ইতিহাসের মূখ্য প্রবণতাসমূহ যথাযথ উপলব্ধির দৃষ্টিভঙ্গি। মনে রাখতে হবে, বাঙালীর ইতিহাসে, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আজকের প্রজন্মের জন্য প্রবল অনুপ্রেরণীয় শক্তি আছে, আছে ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বৃটিশ শাসন বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা পর্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাঙালীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ গ্রহণ ও আত্মোপলব্ধি, বাঙালী মুসলমানের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের প্রভাব ও বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা থাকার কার্যকারণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও পূর্ববাংলার পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তি, সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও বাঙালীর গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার গণতান্ত্রিক দাবীর প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের উপেক্ষা ও সরাসরি বিরোধিতা, ভাষা আন্দোলন এবং পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর অধিকার, প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক সংগ্রাম, সামরিক শাসন ও ঐ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন; অসহযোগ আন্দোলন, ও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালীর ইতিহাসের এই ধারাক্রম এবং এই অব্যাহত সংগ্রামে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পর্যায়ে বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকদের সাহসী ইতিবাচক ভূমিকা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বাংলা কবিতায় ও বাংলা সাহিত্য নতুন নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এই সমকালীন ইতিহাসও তার প্রেক্ষাপটে বাংলা কবিতার ইতিহাস একই সঙ্গে বিষয় ও আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষার উৎকর্ষ ও নানা পর্যায় সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেই একালের বাংলা কবিতার প্রকৃত তাৎপর্যময় ইতিহাস রচনা করতে হবে।

সুতরাং বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার ইতিহাস রচয়িতার থাকতে হবে এই সুস্পষ্ট কালজ্ঞান ও সেই সঙ্গে এ কালের কবিতার বিষয়বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও কাব্যোৎকর্ষ বিশ্লেষণের অন্তর্দৃষ্টি। বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতা বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর সতত সচেতন সংগ্রামের বহুতলের ইতিহাসবহ ও একই সঙ্গে বাঙালীর কাব্যোৎকর্ষের নানা চূড়ায় জয়পতাকা উত্তোলনের কীর্তিচিহ্নিত। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বাঙালীর এইসব গৌরবগাথা রচনাই বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার ইতিহাস রচয়িতার অভিষ্ট; তাঁর কাছে একালের কবি ও কাব্যবোদ্ধাদের এই হচ্ছে প্রত্যাশা।

# বিশ শতকের কথা সাহিত্যের কথা

## মিন্নাত আলী

বাংলা সাহিত্য যখন পুরো একশো বছর পার করে ফেলেছে তখন আমাদের যাত্রা শুরু। একশো বছর পেছন থেকে যাত্রা শুরু করলেও, আশার কথা, আমরা এ ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে গেছি। আমাদের কথা-সাহিত্য বর্তমানে গোটা বাংলা সাহিত্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে পেরেছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। ব্যাপারটা খোলাসা করেই বলি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাপ্তাহিক *হিতবাদী* পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) কয়েকটি গল্প (দেনা-পাওনা, গিন্নি, রাম কানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি) প্রকাশিত হয়। আর এদিকে *নব-নূর* প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। কবি ও লেখক, সম্পাদক ও সংগঠক সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬) মাসিক *নব-নূর* প্রকাশ করেন ১৯০৩ সালে। আর এ পত্রিকাতেই আমাদের ছোট গল্পের সূচনা। পত্রিকাটি জীবিত ছিল তিন বছর ন'মাস। ছোট গল্পের কথায় পরে আসছি।

কথা-সাহিত্যে আমাদের সাধনার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা কারণে আমাদের মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দ এদিকে মনোযোগ দেন অনেক দেরীতে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সক্ষম মুসলিম লেখক মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) থেকে শুরু করে শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) পর্যন্ত যাঁরা কথা সাহিত্য রচনা করেছেন, দেখা যায় তাঁরা সবাই পুঁথি সাহিত্যকে তাদের রচনার উপজীব্য করেছেন। সমকালীন সমাজ ও জীবনের দিকে না তাকিয়ে তাঁরা ঐতিহ্য-চেতনার কারণেই পুঁথিকাব্য এবং মুসলিম ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরান।

মুসলিম কথা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নিদর্শন মীর মোশাররফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু* (১৮৮৫-৯০), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) এর *শাহনামা* (১৯০৯), *তাপস কাহিনী* (১৯১৪) বা শেখ ফজলুল করিমের *লাইলী মজনু* (১৯০৩) সর্বত্রই পুঁথির কাহিনী বা ইসলামের ইতিহাস-এর কাহিনী নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সে যুগে মুসলিম কথা-সাহিত্যিকদের মাঝে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়—সেটা হলো কথা-সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনা। জাতীয় ও সামাজিক জীবনের এক ঐতিহাসিক সঙ্কটক্ষণে তাঁরা কথা-সাহিত্যে এই প্রতিবাদী চেতনার প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন। হিন্দু সাহিত্যিকদের বিশেষ করে



বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৪-১৮৯৪) সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনাসিক্ত উপন্যাস ও আখ্যানসমূহের জবাব দিতে গিয়েই যে তাঁদেরকে এই অবাঞ্ছিত কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয়, তা ঐতিহাসিক সত্য। শিল্পসার্থক রচনার পটভূমি নির্মাণ না করলেও এইসব উপন্যাস যে মুসলিম জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংক্রান্ত সচেতনার জন্ম দিয়েছে, তা অনস্বীকার্য। ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)-এর *রায়নন্দিনী* (১৯২৮), *তারাবাঈ* (১৯২৮ দ্বিতীয় সং) *ফিরোজা বেগম* (১৯২৭ ২য় সং) প্রভৃতি উপন্যাসে মুসলিম চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপটি উন্মোচিত হয়েছে। কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) *আব্দুল্লাহ* (১৯৩৩) ও মোহাম্মদ মজিবর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩) এর *আনোয়ারা* (১৯১২) প্রকাশের মধ্য দিয়েই সমাজ-সমস্যাভিত্তিক উপন্যাস রচনার মুসলিম প্রয়াস সূচিত হয়। আমাদের কথা-সাহিত্যে একরামুদ্দিনই (১৮৮০-১৯৩৫) প্রথম শহুরে জীবনকে উপস্থাপন করেন। তাঁর *কাঁচ ও মনি, নতুন মা* ও *জীবনপণ* প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জীবনচিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুগে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দু'জন মহিলা কথাশিল্পী আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন; তাঁরা হলেন—বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) ও নূরন্নেসা খাতুন (জন্ম-১৮৯৪)। তিনি *স্বপ্নদৃষ্টা* (১৯২৩), *জানকীবাঈ* (১৯২৪), *ভাগ্যচক্র, বিধিলিপি, নিয়তি* প্রভৃতি উপন্যাস লিখে সেকালে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি 'বিদ্যাবিনোদিনী' ও 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত হন।

কবি অভিধায় পরিচিতি হলেও শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) *মরুর কুসুম, সোনার কাঁকন, রিক্তা, শিরি-ফরহাদ* প্রভৃতি চৌদ্দটি ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের মনমানস ও শিল্প চেতনার অধিকারী হওয়ার ফলে আকবর উদ্দিন (১৮৯৬-১৯৭৮)-এর *মাটির মানুষ* (১৯৩০), *অভিনেতা, বেড়াজাল* প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ বিশেষভাবে ধরা পড়েছে।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) এর হাতে আমাদের কথা-সাহিত্য নতুন দিগন্তে সম্প্রসারিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে তাঁর রচনার সাধারণ চরিত্রে পরিণত করেছেন। তাঁর *আয়না* (১৯৩৫), *ফুড কনফারেন্স* (১৯৫০)-এর শিল্পচরিত্রে ভাস্বর। *জীবন ক্ষুধা* (১৯৫৫), *সত্য মিথ্যা* (১৯৫০) ও *আবে হায়াত* (১৯৬৮) তাঁর গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১)-এর *মোমেনের জবানবন্দী* তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি ঠিক উপন্যাস নয়, তবে মাহবুব-উল আলমের আত্মজীবনী ধরনের রচনা। তাঁর বিতর্কমূলক উপন্যাস *মফিজন* (১৯৪৮) ছাড়াও *গাঁয়ের মায়া* (১৯৪৯) নামে আরেকটি উপন্যাস রয়েছে।

কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর *বাঁধন হারা* (১৩৩৪) বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। তাঁর *কুহেলিকা* (১৩৩৮), ও *মৃত্যুক্ষুধা* (১৩৩৭) বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে লিখিত।

প্রাক-পাকিস্তান যুগের শেষ উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হচ্ছেন—আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)। *চৌচির* (১৯৩৪), *সাহসিকা* (১৯৪৭), *প্রদীপ ও পতঙ্গ* (১৯৪৮), *জীবন পথের যাত্রী* (১৯৪৮) ও *রাঙ্গা প্রভাত* (১৯৫৭) প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর সমাজ সচেতন ও সংস্কারকামী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপরে ৪৭-এর বিভাগোত্তর কাল থেকে ৭১ পর্যন্ত মোটামুটি এই পঁচিশ বছরে আমাদের দেশে চারশত জন উপন্যাসিক দেড় হাজারের মত উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে ক'জন উল্লেখযোগ্য উপন্যাসিকের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)-এর *লালসালু* (১৯৪৯), আবু ইসহাক (১৯২৬)-এর *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫), শওকত ওসমান (১৯১৭)-এর *জননী* (১৯৫৮), আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১)-এর *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* (১৯৬০), জহির রায়হান (১৯৩৩-৭২)-এর *হাজার বছর ধরে* (১৯৬৪) গ্রামীণ জীবনচিত্র প্রধান উপন্যাস।

নগর জীবনকে নিয়ে সার্থক উপন্যাস লিখেছেন আবুল ফজল তাঁর *জীবন পথের যাত্রী* (১৯৪৮), আবু রুশদ (১৯১৯) তাঁর *নোঙ্গর* (১৯৬৮) রশীদ করিম (১৯২৭) তাঁর *উত্তম পুরুষ* (১৯৬১) দিলারা হাশেম তাঁর *ঘর মন জানালা* (১৯৬৫), হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-৭৭) তাঁর *নির্জন মেঘ* (১৯৬৫) উপন্যাসে।

আর নগর ও গ্রামের পরিব্যপ্ত পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস হচ্ছে আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২) এর *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৬)-এর *সংশপ্তক* (১৯৬৫), সরদার জয়েনউদ্দিন (১৯২৩-)-এর *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৮) আব্দুর রাজ্জাক (১৯২৪-) এর *কন্যাকুমারী* (৬৭), আনোয়ার পাশা (১৩৩৫)-এর *নীড় সন্ধানী* (১৯৬৮) প্রভৃতি।

আমাদের ঔপন্যাসিকগণ বাংলাদেশের উপজাতি, বেদে, জেলে, নাবিক ও আঞ্চলিক জীবন নিয়েও সুন্দর সুন্দর উপন্যাস লিখেছেন। এগুলো হচ্ছে শামসুদ্দিন আবুল কালাম (১৯২৬) এর 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) ও *কাঞ্চনমালা* (১৯৫৬), আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী* (১৯৬২) সরদার জয়েনউদ্দীনের *পান্নামোতি* (১৯৬৪) শহীদুল্লাহ কায়সারের *সারেং বৌ* (১৯৬২), তাসাদ্দুক হোসেন (১৯৩৪) এর *মহুয়ার দেশ* (১৯৫৮) প্রভৃতি।



সাহিত্যে সমালোচকগণ যৌনবিকৃতি, মনোবিকলন ও দার্শনিক ভাবনাপ্রধান উপন্যাস হিসাবে আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০), *শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪), *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮), রাজিয়া খানের (১৯৩৬) *বটতলার উপন্যাস* (১৯৫৮)। সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫) *দেয়ালের দেশ* (১৯৬০), *এক মহিলার ছবি* (১৯৫৯), *অনুপম দিন* (১৯৬২), শওকত আলীর (১৯৩৬) *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৪)ও শহীদ আখন্দ (১৯৩৫)-এর *পান্না হলো সবুজ* (১৯৬৪) প্রভৃতি উপন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তা'ছাড়া ইতিহাসচেতনা ও ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১১) এর *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* (১৯৬৩) সরদার জয়েনউদ্দীনের *নীলরঙ রক্ত* (১৯৬৮), সত্যেন সেন (১৯০৭-৮২)-এর *আল বেরুনী* (১৯৬৯) আর খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৪-) এর *কতো ছবি কতো গান* (১৯৬৮) উপন্যাসগুলি।

তারপরেই স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ। নতুন দেশ-নতুন উদ্যম। সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টিসুখের উল্লাস! সাহিত্য-শিল্পে নতুন জোয়ার। সে আরেক ইতিহাস। এখন আসি আমাদের কথা সাহিত্যের ছোট-গল্পের কথায়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯০৩ সালে 'নব-নূর' পত্রিকায় আমাদের ছোট গল্প লেখার সূচনা। তারপর ছোটগল্প প্রধানত: প্রকাশিত হতে থাকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ও মোজাম্মেল হক (১৮৮৩-১৯৭৬, *জাতীয় মঙ্গল কাব্য* প্রণেতা) সম্পাদিত *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* (প্রথম প্রকাশ ১৯১৮), *জোহরা* উপন্যাস-প্রণেতা মোজাম্মেল হক ১৮৫৮-১৯৬০) সম্পাদিত *মোসলেম ভারত* (প্রথম প্রকাশ ১৯২০), মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন (১৮৮৯) সম্পাদিত *সওগাত* (প্রথম প্রকাশ ১৯১৮), মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-৬৮) সম্পাদিত *মাসিক মোহাম্মদী* (দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯২৬), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) সম্পাদিত *জয়তী* (প্রথম প্রকাশ ১৯৩০), হবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬) ও শামসুন্নাহার (১৯০৮-১৯৬৪) সম্পাদিত মাসিক *বুলবুল* (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫) প্রভৃতি পত্রিকায়। ১৯৪২ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির রজতোৎসবে' জাহরুল হক কর্তৃক লিখিত ও পঠিত "আমাদের কথা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিবেচনাযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেন—

> 'আমরা আমাদের বিগত পঁচিশ বছরের সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, গল্প ও উপন্যাস পরিমাণের দিক দিয়ে নেহাৎ কম রচিত হয়নি। কিন্তু

গুণের দিক দিয়ে খুব কমই রচিত হয়েছে যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। কিন্তু এই পঁচিশ বছরের মধ্যে যে ভাল উপন্যাস লেখা হয়নি একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। কতকগুলি বই সত্যি খুব ভাল হয়েছে। নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা', 'শিউলি মালা' আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই তিন খানি বইতে যেমন জীবনের বাস্তব ছবি রয়েছে, তেমনি রয়েছে অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণ ও মনস্তত্ত্বের নিখুঁত বিশ্লেষণ। মাহবুব-উল আলমের *মোমেনের জবানবন্দী* ও *পল্টন জীবনের স্মৃতি*, একরামুদ্দিনের *কাঁচ ও মনি*, কাজি ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ* প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাস্তবিকই উচ্চস্তরের কথা-সাহিত্য। মওলবী আবুল কালাম শামসুদ্দিনের *পোড়োজমি* যদিও অনুবাদ তবু বেশ সফল সৃষ্টি। এইরূপ ভাল উপন্যাসের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং ভাল উপন্যাস লেখকের সংখ্যা আরও কম। উপন্যাস রচনা অপেক্ষা ছোট গল্প রচনায় আমরা বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছি। যে কয়খানা ছোট গল্পের বই রচিত হয়েছে তার সংখ্যা খুবই কম কিন্তু তারমধ্যে অনেকগুলি গল্প গ্রন্থ আধুনিক বাঙ্গালা কথা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সুফিয়া এন. হোসেনের *কেয়ার কাঁটা*, মওলবী আবুল কালাম শামসুদ্দিনের *ত্রিস্রোতা*, আবুল ফজলের *মাটির পৃথিবী* প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে আমরা যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় পাই। উপরন্তু মোহাম্মদ মোদাব্বেরের *মিসেস লতা সান্যাল*, আবু রুশদ-এর *রাজধানীতে ঝড়* নাজিরুল ইসলামের *সোনালী স্বপন* প্রভৃতি গ্রন্থে এই সমস্ত লেখকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু আশা আমরা করতে পারি।'

এর কয়েক বছর পর কলকাতা থেকে *মুসলিম সাহিত্যের সেরা গল্প* নামে একটি সুন্দর গল্প-সংকলন বের হয়। এতে প্রত্যেক লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি– জন্মকাল, জন্মস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাহিত্যিক প্রচেষ্টা প্রভৃতি প্রাসংগিক কথার উল্লেখ করা হয়। এই সংকলনে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) এর 'নারীসৃষ্টি', মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ (১৮৮০-১৯৪৬) এর 'দোস্ত ও দুষমন', এস.ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)-এর 'মেয়ে', ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-)-এর 'লক্ষ্মীছাড়া', কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-) এর *'তরুণ'*, মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১)-এর 'আবহাওয়া' আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)-এর 'নেহাৎ গল্প নয়', কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর 'হেনা', মতিন উদ্‌দীন আহমদ (১৯০০-১৯৮০)-এর 'ডোর-কাঁটা ঘুড়ি', আবুল ফজল (১৯০৫-১৯৮৩)-এর 'কবিতার কাঁটা', নাজিরুল ইসলাম (১৯০৬-) এর 'কৃতী পুরুষ', মহীউদ্দিন (১৯০৬-১৯৭৫)-এর 'ডাক্তার মরেনো' আব্দুর রহমানের 'পদাতিক', আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)-এর 'বোবা জোয়ার', শওকত ওসমান (১৯১৯- ) এর 'পদ্মফুল', আবু রুশদ (১৯১৯- )-এর 'অভাবনীয়', মবিনউদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৭৮)-এর 'এক নিঃশ্বাসের গল্প', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)-এর 'খন্ড চাঁদের বক্রতায়' ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৯২৬)-এর 'কেরায়া নায়ের মাঝি'- এই ১৯টি 'সেরা গল্প' সংকলিত হয়।



পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর-বিশেষ করে বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার ফলে কলকাতার মুসলমান সাহিত্যসেবী প্রায় সবাই চলে এলেন ঢাকা। কলকাতার *দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত, বেগম* চলে এলো ঢাকা। সরকারী মাসিক পত্র *মাহে নও* ছাড়াও রাজধানী থেকে প্রকাশিত হতে লাগলো নতুন নতুন সাহিত্য পত্র-পত্রিকা। কবি-সাহিত্যিক, সাহিত্যকর্মীদের মধ্যে দেখা দিলো নব-সৃষ্টির উল্লাস। নবীণ-প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকের নতুন-নতুন রচনায় ভরতে শুরু করলো আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডার। প্রবীণ সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলম এ সময়ে (১৯৫৪ সালে) প্রকাশ করলেন তাঁর *সংকট কেটে যাচ্ছে* বলে এক আশাবাদী প্রবন্ধের পুস্তক। কথা সাহিত্যের পাতায় নতুন গল্প লেখকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদেরঃ আজহারুল ইসলাম, আবদুল হাই মাশরেকী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আসহাবউদ্দিন আহমদ, আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, আশরাফুজ্জামান, আকবর হোসেন, আনিস চৌধুরী, আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরী, আতোয়ার রহমান, আবু ইসহাক, খালেকদাদ চৌধুরী, গোলাম রহমান, জেবু আহমদ, রাবেয়া খাতুন, নুরুন নাহার, বুলবুল চৌধুরী, বেদুইন শমসের, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ মোদাব্বের, মোহাম্মদ নাসির আলী, মফিজ-উল-হক, মিন্নাত আলী, রশীদ করিম, রোকনুজ্জামান খান, শাহেদ আলী, শহীদুল্লাহ সাবের, সরদার জয়েন উদ্দিন, সৈয়দ আতিকুল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান ও হামেদ আহমদ-এই ত্রিশ জন কথাশিল্পী।

এর পরের বছরই-১৯৫৫ সালে রুহুল আমিন নিজামীর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলো ৩৭০ পৃষ্টার এক গল্প সংকলন- *পূর্ব বাংলার সমকালীন সেরা গল্প*। ৩০ জন গল্প লেখকের ত্রিশটি গল্পের সংকলক ভূমিকায় বলছেন—

'নয়া রাষ্ট্র, নয়া চেতনা। ...শিল্পীরা খুঁজতে লাগলেন পূর্ববঙ্গের সমাজ জীবনের চাবিকাঠি। একেবারে নাড়ির সন্ধানটি যে চাই। ঢুঁড়ে বেড়ানো শুরু হলো। আবার নতুনের দলও এগিয়ে এলেন। এঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এলেন, নিচুতলার শরিকদের সুখ-দু:খের ভাগীদার-দাবিদার হয়ে গাইলেন তাদের পাঁচালী। আবার জান দিয়ে বাংলা ভাষা-তথা সাহিত্যের মান বাঁচাতেও আগুয়ান হয়ে গেলেন।... প্রবীণদের মধ্যে আছেন উভয়বঙ্গের স্বীকৃতিনামা পাওয়া শিল্পী আবুল ফজল, মাহবুব-উল আলম, নবীনদের মাঝে আছেন শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, বুলবুল চৌধুরী প্রভৃতি। আবার একেবারে নতুন দলে আছেন মুনীর চৌধুরী, আবু রুশদ, আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সরদার জয়েন উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম, ফজলে লোহানী, শাহেদ আলী, আবদুল হাই এবং আরো অনেকে। এক কথায় যাঁর ভেতরেই সম্ভাবনা আছে তিনিই নিজের স্বাধিকারে এখানে ঠাঁই করে নিয়েছেন।'

ছোটগল্পের ইতিহাস রচনায় গল্প-সংগ্রহের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। সেজন্যই আমরা বাংলাদেশের গল্প-সংকলনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে চাইছি।

১৯৫৮ সালে ঢাকা থেকে সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় *গল্প-সংগ্রহ* প্রকাশিত হয়। বইখানা দুই খণ্ডে সাড়ে পাঁচ শ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মুসলমান গাল্পিকদের রচনাই এতে স্থান পায়। এই *গল্প সংগ্রহ* সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দিন বলেন—

> 'মুসলিম গল্প-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধারার পরিচয় দান সম্পর্কে সংগ্রাহক সচেতন ছিলেন না, এ কথা হয়ত বলা চলে না। কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁর গল্প-চয়ন খুব সুসঙ্গত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। মোহাম্মদ নাজিবর রহমানের যে রচনাংশ তাঁর সংগ্রহ-গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে, তাকে কোনো দিক দিয়েই ছোট গল্প বলা চলে না। ...বাঙলার মুসলমানদের রচিত গল্প-সাহিত্যের ক্রমবিকাশধারায় মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ, একরামুদ্দিন ও গোলাম কাসেমের অবদান অনস্বীকার্য বলেই আমরা মনে করি। এ সংগ্রহ-গ্রন্থে তাঁদের রচনার স্থান হয় নাই, এটা খুব পরিতাপের বিষয়। আমাদের গল্প-সাহিত্যের ক্রমবিকাশধারার পরিচয়-দানের ব্যাপারে এ একটা খুব বড় ত্রুটি বলেই আমাদের ধারণা।...সত্যিকার ছোটগল্প লেখক নির্বাচন সম্পর্কে সংগ্রাহক মোটামুটিভাবে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পেরেছেন বটে কিন্তু সেদিক দিয়েও কিছু ত্রুটি নাই, এ কথা বলতে পারি না। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হাসনাৎ- এঁরা ঠিক গল্প লেখক নন, গল্প-লেখক হিসাবেও ঠিক এঁদের প্রতিষ্ঠা নয়। 'গল্প-সংগ্রহ'-এর মতো প্রতিনিধিমূলক গল্পধারার পরিচয়বাহী গ্রন্থে এঁদের টেনে না আনলেই ভালো হতো। ...এ সংগ্রহে কয়েকজন লেখকের গল্প বাদ পড়ছে বলেও মনে হয়। মঈনুদ্দীন, আকবর উদ্দীন, মোহাম্মদ কাসেম, জাহিদুল হোসেন এককালে ভালো গল্প লিখেছেন। এঁদের ভালো গল্পের স্থান হলে এ সংগ্রহ অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক হতে পারতো। এসব দোষ ত্রুটি সত্ত্বে *গল্প সংগ্রহ* আমাদের সাহিত্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই। বাঙলার মুসলমানদের গল্প-সাহিত্য রচনার সাধনার ধারাবাহিক পরিচয় এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'

এ পথ ধরেই ১৪ আগস্ট ১৯৫৯ সালে আজাদ পাবলিশিং হাউজ প্রকাশ করে *শতদল*। দু'খণ্ডের প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার গল্প-সংগ্রহটি সম্পাদনা করেন মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন *শতদলে* একশ লেখকের একশ'টি গল্প স্থান পায়। এর ভূমিকা লিখেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)। এর তিন-চার বছর পর ১৯৬৩ সালে রশীদ পাবলিশিং হাউস প্রকাশ করে ৫৬০ পৃষ্ঠার *সেকাল ও একালের সেরা গল্প*। প্রবীণ সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন ও নবীণ কথা-শিল্পী আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর যুগ্ম



সম্পাদনার এই সংকলনে সেকালের পনের জন ও এ কালের সাতাশ জন কথা-শিল্পীর ছোট গল্প স্থান পেয়েছে। এ সংকলনটিতেও লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত দেয়া হয়েছে।

উপন্যাস বা ঔপন্যাসিককে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করা যায় গল্প-লেখককে তেমন কোন একটি বৃত্তে আবদ্ধ করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তবু আমরা মোটামুটি ভাবে বলতে পারি আমাদের প্রাথমিক যুগের গল্প-লেখকদের মধ্যে একরামুদ্দিনের রচনায় লঘু হাস্য পরিহাস যেমন আছে তেমনি দেখা গেছে সামাজিক জীবনের নানা দৈব ব্যাপার, নানা জটিল ও গূঢ়তর ঘটনার বিবরণ। তাঁর রচনার মধুর সরসতা গল্পে প্রাণ সঞ্চার করেছে। হেদায়েতুল্লাহ তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়ে একটি বিশিষ্ট নীতিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেই নীতি হিন্দু মুসলমানের মিলন। গোলাম কাসেমের উপমাপ্রধান রচনা ও সাধুভাষার জটিলতা ভাষার গতিকে মন্থর করেছে। তবে গোলাম কাসেমের কৃতিত্ব এই খানে যে সমস্ত জটিলতা সত্ত্বেও কাহিনীর গতি পাঠককে ধরে রাখে। তাঁর পরবর্তী *চল্লিশের* দশকের গল্প লেখকদের অন্যতম আবুল ফজল সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট— অনাগত কালের কাছে আবুল ফজলের পরিচয় ভাল মুসলমান লেখক বলে হবে না; বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কথা সাহিত্যিক রূপে। আর তার সঙ্গে হয়তো অনিবার্যভাবে যুক্ত হবে-'সচেতন শিল্পী'।

আবুল মনসুর আহমদের খ্যাতি প্রধানত তীক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক রচনার রীতির জন্য। তাঁর বিদ্রূপের শানিত ভঙ্গি অনন্যসাধারণ। মাহবুব-উল আলম তাঁর গল্পে মুসলমানদের সুখ-দু:খ ও আশা-ভরসা, বিশেষ করে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রস ও আবেদনকে স্ফূর্ত করে তুলেছেন।

আবু জাফর শামসুদ্দীন মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থ-ঘটিত সংকটের দ্বন্দ্ব নিয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে বুদ্ধির ভূমিকা বেশি। শওকত ওসমান জীবনবাদী বক্তব্য-প্রধান গল্প লেখেন। তিনি রয়েছেন শোষিত নির্যাতিত মানুষের পক্ষে।

সরদার জয়েনউদ্দিন আর শামসুদ্দিন আবুল কালাম পল্লী বাংলার আন্তরিক রূপকার। তাঁরা জীবনবাদী ধারার লেখক এবং ঐতিহ্য-আশ্রয়ী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ হচ্ছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার লেখক। বাংলা ছোট গল্পের প্রচলিত ও পরিচিত ধারা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে তিনি আপন স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করেছেন। আবু রুশদ মুখ্যত; সমাজের উপর তলার চিত্রকর। শাহেদ আলী পূর্ববাংলার ভূ-প্রকৃতি ও লোক চরিত্র অংকনে কুশলী চিত্রকরের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আবু ইসহাক পল্লী বাংলার প্রাণকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। সচেতন শ্রেণী সংগ্রামের চিত্র তাঁর গল্পে পাওয়া যায়। পঞ্চাশ দশকের

আলাউদ্দিন আল আজাদই প্রথম আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত শ্রমিক জীবনের আলেখ্য উপহার দিয়েছেন। তার সমসাময়িক মিন্নাত আলী সমাজ-সচেতন লেখক আপন লেখক—দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সজাগ। তিনি কিছু রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক গল্পও লিখেছেন। মির্জা আ.মু. আবদুল হাই তাঁর গল্পে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র ও রস-মাধুর্যের ব্যঞ্জনা পাঠকমনকে আবিষ্ট করে তোলে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর গল্পে সমাজ-চিত্র পাওয়া যায়। জীবনের প্রকৃত সমস্যা ও ছায়াপাত করে। কিন্তু জীবনের বস্তুগত সমস্যা নিয়ে কালক্ষেপ করেন না।

হাসান হাফিজুর রহমান সমাজচিন্তামূলক, ইঙ্গিতময় ও বক্তব্য প্রধান গল্প লিখেছেন। সৈয়দ শামসুল হক বুদ্ধিবাদী গল্পকার। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিবাদী জীবনের মনোভূমি তাঁর প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সাধারণ মানুষের কথা লিখেছেন কিন্তু সাধারণের ভাষায় নয়। তাঁর ভাষা গম্ভীর ও দৃঢ়। সাইয়িদ আতিকুল্লাহ দক্ষ ও শক্তিমান গল্পকার। তিনি প্রকৃত নাগরিক গল্পকার। আবদুস শাকুর গভীর ও তীব্র সব ইঙ্গিতবাহী সমাজ-সচেতন গল্প লিখেছেন।

পরবর্তী দশকের শওকত আলীর বেগবান স্বচ্ছন্দ প্রকাশক্ষমতা রয়েছে। তিনি মাটি-ঘেঁষা মানুষের জীবন কাহিনী লেখেন। হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভয়ঙ্কর ইতিহাস রূপলাভ করেছে। জনজীবন থেকে আত্মনির্বাসিত ছোট গল্প লেখক জ্যোতি প্রকাশ দত্তের ভাষা প্রাঞ্জল কিন্তু সুগ্রথিত, যথাযথ ও গম্ভীর। রাহাত খান একান্ত নিজস্ব রীতিতে আচ্ছন্নভাবে সমাজচিত্রকে যতটা পারেন পরিস্ফুট করেন।

১৯৭১ সালের পর আমাদের ছোট গল্পে এক নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে। সেটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক ছোট গল্প বেশ লেখা হয়েছে। এই সব গল্পের শিল্প মূল্য এবং সাহিত্যে এদের প্রকৃত স্থানটি কী- তা নির্ধারণে সময় লাগবে।

আপাতত এই হচ্ছে আমাদের ছোট গল্প। নাগরিকতা, সভ্যতা, বিত্ত ও বিত্তহীনের দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি জনগণের মানসিকতা ও চিন্তার বিবর্তনই বর্তমান কালের গল্পের উপজীব্য। সব মিলিয়ে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে ছোট গল্পের ধারা একটি গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করবে, এ আশা মোটেই আর কোন দুরাশা নয়।

# বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা

অনিমেষ কান্তি পাল

।। এক ।। সাহিত্যের ইতিহাস

সাহিত্যের ইতিহাস কেবল কালপঞ্জী নয়, কেবল নাম এবং সন, তারিখের বিবরণ নয়। সাহিত্যের ইতিহাসও, এক ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিও নিশ্চয়। অন্যদিকে এও বলতে হয় যে সাহিত্যের ইতিহাস, ইতিহাস বলেই তা অবশ্যই কালপঞ্জী এবং সন, তারিখ বাদ দিয়ে কোনো ইতিহাসই হয় না, সাহিত্যের ইতিহাসও নয়। তাছাড়া, সাহিত্যের ইতিহাসে কী কী থাকবে, কীসের উপর জোর পড়বে, কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হবে এসব প্রশ্নেও বহু বাদানুবাদের অবকাশ আছে। হিস্টিরিওগ্রাফীর ব্যাপারটা এখন আর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ইতিহাস লেখা হত রাজা-বাদশাহদের নিয়ে, তাদের যুদ্ধবিগ্রহ এবং কীর্তি-কথা নিয়ে। তারপর একদিন ডঃ নীহার রঞ্জন রায় লিখলেন *বাঙ্গালীর ইতিহাস*[১] যাতে পাওয়া গেল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নানা খুঁটি-নাটি বিবরণ। দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে যে একটা নাড়া লাগল তা অস্বীকার করা যায়না। তারপর পাওয়া গেল ডঃ সমরেন্দ্র নাথ সেনের *বিজ্ঞানের ইতিহাস*[২]। বাংলা ভাষায় এটাও একটা স্মরণীয় সংযোজন। বিজ্ঞানের ইতিহাস, ইতিহাস আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত কিনা তা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্নই তুললেন না।

অতএব সাহিত্যের ইতিহাস তো হতেই পারে। তার সঙ্গে রাজা-রাজড়ার সম্পর্ক আছে কিনা, যুদ্ধ বিগ্রহের যোগ আছে কিনা, ধর্মের যোগ আছে কিনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কী সম্পর্ক—এসব কথা ক্রমশ উঠছে, এবং আরো উঠবে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে বিতর্ক, মনে হয়, থেকেই যাবে কারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকে সহজে উড়িয়ে দেওয়া যাবেনা কোনোদিনই। তবু সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। এবং ভবিষ্যতে আরো রচিত হবে। প্রায় সব সাহিত্যের ইতিহাসেই কিন্তু সাহিত্যকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করে দেখা হয়, যেমন-কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি। আবার সব সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা যায় কালগত বিভাজন, যেমন- প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ইত্যাদি। এই ধরনের বিভাজন ছাড়াও আরো অন্য ধরনের বিভাজনও দেখা

যায়। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এলিজাবেথীয়, ভিক্টোরীয় ইত্যাদি নামেও যুগবিভাজন করা হয়েছে।

সাহিত্য ব্যাপারটা প্রাচীন কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস নিতান্তই আধুনিক। ধরা যাক সংস্কৃত সাহিত্যের কথা। নিঃসন্দেহে এ সাহিত্যের বয়স কমপক্ষে তিন হাজার বছর। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখার কথা কেউ ভাবেন নি। এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ইউরোপীয় পন্ডিতবর্গ[৩]। অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কেবল আধুনিক কালেরই ব্যাপার নয় তা আধুনিক কালের পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চারই একটি শাখা হিসেবে উদ্ভূত। পাশ্চাত্যে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পিছনে মূল প্রেরণা ছিল নিজেদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি মমতা। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী মনোভাবই জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মূলে কাজ করেছিল। ভারতেও একই প্রেরণা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

## ।। দুই ।। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পদে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন *সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব*[৪]। তার কিছুদিন পরে পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখলেন- *বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*[৫]। রামগতি ঠিক কতটা জাতীয়বাদী মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা বলা যায় না তবে দেশজ সাহিত্যের প্রতি তাঁর লেখায় মমতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বরং ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় জাতীয়তাবাদী মনোভাব সোচ্চার এবং তিনি ভারতচন্দ্রের জীবনী লিখে, রামমোহনের গদ্য রচনার প্রশংসা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবই ঘোষণা করে গেছেন[৬]। কিন্তু দীনেশ চন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেই*[৭] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একটা মোটামুটি সামগ্রিক চেহারা পেল। তবে এই রচনার অপূর্ণতা পুরোপুরি অস্বীকার করা গেলনা। কারণ তখনো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অনেক তথ্য জানা ছিল না। সুকুমার সেন মহোদয়ের *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*[৮] পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত হওয়ার পরেও বাংলা সাহিত্যের আর একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হলেন ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়[৯]। কিন্তু এরপরেও কলম ধরেছেন-গোপাল হালদার[১০], শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১১], ভূদেব চৌধুরী[১২] প্রমুখ আরো অনেক পন্ডিত ব্যক্তি।

বৃটিশ শাসন শেষ হলো, দেশ ভাগ হলো। পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হল, বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলো এবং বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে উঠল। ঢাকা-কলকাতা দুই দেশ হয়ে গেল এবং দুই দেশের মধ্যে নানা রকমের বেড়া উঠে গেল। বই,



পত্র–পত্রিকার অবাধ আদান প্রদান বন্ধ হয়ে গেল। ফলে পূর্ববঙ্গে, বর্তমান বাংলাদেশে '৪৭ সালের পরেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আবারো নতুন করে লেখার উদ্যম শুরু হলো। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বই পাওয়া গেল না বলেই যে কেবল ঢাকায় বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস লেখা শুরু হল,– তা নয়, ছিল আরও একটা গভীর কারণ। মুসলমান ধর্মাবলম্বী লেখকদের রচনাবলীকে পূর্বোক্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইগুলিতে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কিংবা যে সমাদর তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য ছিল সেই সমাদর পূর্বোক্ত গ্রন্থকাররা তাঁদের দেখান নি- এই রকম একটা অভিযোগ উঠেছিল। এ অভিযোগ মিথ্যা, তাও বলা যায়না কারণ সুকুমার সেন পরে *ইসলামী বাংলা সাহিত্য* বলে[১৩] আলাদা একটা বই লিখেছিলেন। তাছাড়া মুহম্মদ এনামুল হকের *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*[১৪] গ্রন্থটিও বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল।

কিন্তু ঢাকায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হল অন্য আর একটা কারণে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চাই। এই বই পড়ে তাঁরা বাংলা অনার্স এবং এম, এ পরীক্ষায় বসবেন। তাই ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ[১৫], ডঃ হাই[১৬] এবং ডঃ আহ্সান[১৬] প্রমুখ খ্যাতিমান পন্ডিতদের লেখা কয়েকটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বই প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর দুই বাংলাতেই আরো বহু ছাত্রপাঠ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে। ব্যতিক্রম কেবল একটি-ডঃ আহমদ শরীফ[১৭] লিখিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসটি। অপক্ষপাতী, তথ্যনিষ্ঠ মনোভাব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এই বইটি প্রচলিত অন্য বইগুলোর চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা মর্যাদার অধিকারী। তবে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ক্ষেত্রে না হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নিয়ে, বিশেষিত, যাকে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক যুগ, তার নানা অংশ নিয়ে বহু নতুন গবেষণা দুই বাংলাতেই বেশ চোখে পড়ার মতো।

দু একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা যাক। প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের বহু অজ্ঞাত নির্দশন উদ্ধার করেছেন ডঃ আনিসুজ্জামান[১৮], ডঃ সবিতা দাস (চট্টপাধ্যায়)[১৯] বাংলা ভাষার অভারতীয় লেখকদের রচনা সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য উদ্ধার করেছেন। এই ধরনের আরো কিছু কিছু কাজ হয়েছে দুই বাংলাতেই। কিন্তু এইসব কাজ ছাত্রপাঠ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইগুলিতে এখনো প্রবেশাধিকার পায়নি। ইংরেজি সাহিত্যের কিংবা ফরাসী কিংবা রুশ সাহিত্যের যত ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং যেভাবে লেখা

হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তত লেখা হয়নি, এবং মোটামুটি একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখা হয়েছে কেবল। সেদিক থেকে দেখলে, বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার চেষ্টা অনেক দুর্বল এবং সীমাবদ্ধ।

## ।। তিন ।। কতো রকমের সমস্যা

অনেকেই হয়তো এখানে বলবেন যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যত সমস্যা আছে এমন বোধ হয় অন্য কোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেই, তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি এতদিন।

প্রথমত, মনে হতে পারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা অতিশয় শ্রমসাধ্য, বহু সময়ের ব্যাপার। তাছাড়া কে প্রকাশ করবেন, কে টাকা জোগাবেন এবং পাঠক আদৌ আকৃষ্ট হবেন কিনা এসব ঠিক না হলে লেখক কোন ভরসায় এমন একটা কাজে হাত দেবেন? এর উত্তরে বলা যায় যে এইসব ব্যাপার দীনেশচন্দ্র সেনের আমলে সমস্যা বলে হয়তো গণ্য করা যেত। প্রায় সকলের লেখারই একাধিক সংস্করণ এখন প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাই এখন, এগুলি আর সমস্যা বলে গণ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, অনেকেই মনে করেন যে অমুক অমুক পন্ডিত ব্যক্তির বই যখন বাজারে পাওয়া যায় তখন নতুন করে আর একটা ইতিহাস বই লেখা কেন? এই ধারণাটিও অর্থহীন। কারণ বাংলা সাহিত্য হাজার বছর ধরে পুষ্ট হয়ে চলেছে নানা জনের নানা ধরনের রচনার মধ্যে দিয়ে। প্রতিদিন আসছেন নতুন নতুন লেখক এবং যেসব তথ্য আগে জানা ছিল না তেমন তথ্যও প্রায় প্রতিবছরই কিছু না কিছু জানা যাচ্ছে। কাজেই পূর্ববর্তীরা যা লিখেছেন তারপরে আর নতুন করে কিছু লেখার নেই একথাও মানা যায় না।

তাহলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি ঠিক কী কী? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কী কী নালিশ আছে। এক নম্বর নালিশ হলো-প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্তর্গত বলে যে সব রচনাকে ধরা হয় সেগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়নি এখনো। মধ্যযুগের রচনা বলে যেগুলিকে ধরা হয় তাদের প্রকৃত রচয়িতা কে তা নিয়েও প্রচুর প্রশ্ন আছে। তা হল দু নম্বর নালিশ। তিন নম্বর নালিশ হলো- চর্যাপদ সম্বন্ধে। অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, পূর্বী হিন্দি- কোন ভাষায় লেখা হয়েছিল চর্যাপদ? এ সম্বন্ধে বিতর্ক ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠেছে। যাঁরা রায় দিয়েছিলেন যে চর্যাপদ বাংলাতেই লেখা সেই ডঃ শহীদুল্লাহ[২০] এবং ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[২১] এখন আর বেঁচে নেই। যে ডঃ সুকুমার



সেন[২২] চর্যাপদের উপর অন্যভাষাগুলির দাবি কিছুটা মানতে রাজি ছিলেন তিনিও আর বেঁচে নেই। বিবাদের মীমাংসা কে করবেন এবং কীভাবে করবেন? তারপর, চার নম্বর নালিশ হলো শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সম্বন্ধে। বড়ু চন্ডীদাস, দ্বিজ চন্ডীদাস, দীন চন্ডীদাস, আসল চন্ডীদাসের জট ছাড়াবেন কে? তাছাড়া পুথিটির নাম কী ছিল, এটির ভাষার মধ্যে জালিয়াতি আছে কিনা, পুথিটি ঠিক কবে অনুলিখিত হয়েছিল সেসব প্রশ্নেরও মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। এইসব নালিশের মীমাংসা কেমন ভাবে হবে? এটা হলো এক ধরনের সমস্যা, যাকে বলা যায় তথ্যের সমস্যা।

আর এক ধরনের সমস্যা হলো অন্য আর এক ধরনের নালিশ নিয়ে। মধ্যযুগে যে মুসলমান কবিরা বাংলা ভাষায় লিখেছেন তাঁদের মধ্যে দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল ছাড়া আর কেউ তেমন গুরুত্ব পাননি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে। এটাকে বলা যায় পাঁচ নম্বর নালিশ। এই রকমই ছয় নম্বর একটি নালিশ হলো- দেশ ভাগ হওয়ার পর ঢাকার পন্ডিতবর্গ যে সব নতুন পুথি এবং নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন সেগুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইগুলিতে জায়গা পায়নি। এর মধ্যে কেবল মুসলমান লিখিত পুথিই নেই হিন্দুর লিখিত প্রচুর পুথিও আছে। সাত নম্বর নালিশটি হলো মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগৃহীত পুথিগুলি সম্বন্ধে। তাঁর সংগৃহীত পুথিগুলির (১) তালিকা, (২) বিষয়, (৩) রচয়িতা এবং (৪) গুরুত্ব অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এসম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগ (আহমদ শরীফ বাদে) নেওয়া হয়নি এখনো পর্যন্ত। এগুলি হলো অপক্ষপাতী, উদার এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনোভাবের সমস্যা। একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের এবং বিশেষ করে পন্ডিতবর্গের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে- আশা করা যায় এবং তখন 'কোদালকে কোদাল বলতে' সম্ভবত আর বাধা থাকবে না। অবশ্য কিছু কিছু বই তখন সম্পাদনা করে পুর্নলিখনের ব্যবস্থা করতে হবে কিংবা যত্ন করে বইয়ের তাকে তুলে রাখতে হবে।

## ।। চার ।। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলাদেশী সাহিত্যের ইতিহাস

মনোভাব নিয়েই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আরো একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আমরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব?—রাজনৈতিক? ধর্মীয়? না ভাষাগত? যদি ভাষাগত দৃষ্টিকোন থেকে দেখি তাহলে বলতে হবে- যিনিই লিখুন, যেখানে বসেই লিখুন, বাংলা ভাষায় যদি কোন সাহিত্য রচিত হয় তবে তাকে বাংলা সাহিত্যই বলতে হবে এবং বাংলা সাহিত্য একটি অভিন্ন সত্তা। তার ইতিহাসও একটাই।

এই যদি মনোভাব হয় তাহলে কোনো জটিলতা থাকে না। যদি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক দৃষ্টিকোন থেকে কেউ দেখতে চান তাহলে তাকে বলতে হবে—ভারতের পশ্চিমবঙ্গে রচিত বাংলা সাহিত্য কিংবা ত্রিপুরায় কিংবা আসামে, কিংবা উড়িষ্যায় কিংবা বিহারে কিংবা দিল্লিতে কিংবা লন্ডনে কিংবা আমেরিকায় অথবা স্বাধীন বাংলাদেশে রচিত বাংলা সাহিত্য। এসব রাষ্ট্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কথা। এই ভিন্নতা বা পার্থক্য তো সত্যি ঘটনা। তারাপদ মুখোপাধ্যায় লন্ডনে কাজ করতেন।সেখানে বসে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তিনি[২৩] লিখেছেন। তাঁর লেখাকে কি আমরা বলব ব্রিটেনের বাংলা সাহিত্য? কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনাকে[২৪] বলব বিহারের বাংলা সাহিত্য? স্থানিক পরিচয়, রাষ্ট্রিক পরিচয়, ধর্মীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক পরিচয় মানুষের ক্ষেত্রে সত্য কিন্তু সাহিত্য শাশ্বত কালের বস্তু। হাজার বছর পরে তার ভাষিক বা ভাষাগত পরিচয়টাই থাকবে। অন্য সব ভেদরেখা মুছে যাবে।

সমস্যাটা এখানে আসছে রাষ্ট্রিক পরিচয়কে বড়ো করে দেখা থেকে। অনেকেই বাংলাদেশের পাকিস্তানী পরিচয়ের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নটিকে জড়িয়ে নিয়ে ভেবেছিলেন যে মান্য-চলিত বাংলা ভাষার বোধ হয় একটা ঢাকাই বিকল্প তৈরি হয়ে যাবে[২৫]। এত বছর পরে এখনতো স্পষ্ট যে তা হয়নি, হতে পারে না। কারণ বাংলা সাহিত্য এক, অভিন্ন এবং অবিভাজ্য। আর সাহিত্যের ভাষা বলেই মান্য-চলিত বাংলা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ভাষারীতি। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মিলনের যে উদার আমন্ত্রণ সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় ইংরেজী সাহিত্যের দিকে তাকালে। কতো ভিন্ন রকমের মানুষ কতো ভিন্ন রকমের রাষ্ট্রিক পরিচয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজি সাহিত্যের প্রশস্ত অঙ্গনে মন দেয়া-নেয়ায় যোগ দিয়েছেন। নেলসন ম্যান্ডেলাও ভাষার যোগে ইংরেজি সাহিত্যের আওতার মধ্যে এসে পড়েন; নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিও।

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একখন্ডে লেখা তাঁর *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের* শেষে যুক্ত পরিশিষ্টে রেখেছেন বাংলাদেশী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস[২৬]। এতে পূর্ব বাংলায় সাতচল্লিশের পরে রচিত প্রধান সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। এটাই হচ্ছে একটা সমস্যার কথা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলাদেশী সাহিত্যের জন্য একটা আলাদা চৌহদ্দী থাকবে? না তা কালানুসারে সামগ্রিক ইতিহাসের শৃঙ্খলার মধ্যে থাকবে? শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ প্রমুখ কবিরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে থাকবেন? না তাদের জন্য বাংলা কবিতার আর একটা কোনো ঐতিহ্যের মধ্যে স্থান নির্দিষ্ট হবে? কালানুসারী শৃঙ্খলা সামগ্রিকভাবে অনুসৃত হবে? না খন্ড খন্ড করে ইতিহাস লেখা হবে?



## ।। পাঁচ ।। সাহিত্যের শৃঙ্খলা

ইতিহাসের যেমন একাধিক শৃঙ্খলা আছে তেমনি সাহিত্যেরও আছে নিজস্ব একাধিক শৃঙ্খলা। কালানুসরণের ব্যাপারটি একান্তভাবে ইতিহাসের শৃঙ্খলার মধ্যেই পড়ে। সেখান থেকে সাহিত্যের ইতিহাসে কালানুসরনের প্রবণতা প্রবেশ করেছে। দেশ ও জাতির ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা কী তা নিয়ে অনেক তর্ক আছে কিন্তু সাহিত্যে এবং বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তির ভূমিকার গুরুত্ব নিয়ে কোনো তর্ক নেই। প্রাক-রবীন্দ্র, রবীন্দ্র-সমকালীন এবং রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্য বলতে কী বোঝায় তা শিক্ষিত পাঠক সহজেই বুঝে নিতে পারেন। তেমনি মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকা একটি বিভাজন রেখার কাজ করে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী এবং চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য স্পষ্টত আলাদা। দেশ ও জাতির জীবনে বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিণাম সুদূর-প্রসারী হয়ে থাকে। যেমন ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ কিংবা ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের ভারতত্যাগ। সাহিত্যের ইতিহাসেও কোনো কোনো ঘটনার পরিণাম যুগান্তকারী হয়ে থাকে। যেমন ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা মুদ্রণের প্রারম্ভ।

সাহিত্যের নিজস্ব শৃঙ্খলাটি কী ধরনের? সাহিত্য ক্ষেত্রেও কালানুসরণ অনিবার্য তথাপি বোধ হয় বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রেই কালাতিক্রমণদোষ হয়েও অনেক সময় আদরণীয় যেমন বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের উগ্রজাতীয়তাবোধ। ব্যক্তির উপর সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে বটে কিন্তু সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ যে ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভা এবং মেধার মুখাপেক্ষী একথাও অনস্বীকার্য। একথা সকলেই জানেন যে ব্যক্তি কালিদাস সম্পর্কিত সকল তথ্যই বিতর্কিত কিন্তু কবি কালিদাসের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কোনো বিতর্ক নেই। অতএব সাহিত্যের একটি নিজস্ব শৃঙ্খলা হলো ব্যক্তি-প্রতিভার অভ্যুদয় ও বিকাশের শৃঙ্খলা। যদি কালের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের মত কবির আবির্ভাব সম্ভব হতো তাহলে তাঁর সমকালের সব কবিই রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হতেন। যদি ঠাকুর পরিবারের বিত্ত, যশ এবং সামাজিক প্রতিপত্তি কবি-প্রতিভা বিকাশের অনুকূল বলে মনে করা হতো তাহলে ঐ পরিবারে আরো অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সমান হতে পারতেন। সামাজিক শক্তিগুলির আনুকূল্য অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু তার দ্বারাই কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে excellence বা পরমোৎকর্ষ সৃষ্টি হয় না। এজন্য ব্যক্তি–প্রতিভার excellence অতি অবশ্যই প্রয়োজন। সাহিত্যের ইতিহাস কি সাহিত্যে excellence বা পরমোৎকর্ষের অনুসরণ?

অনেকের কাছেই এই ধারণাটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হতে পারে। কারণ এর গায়ে elitist গন্ধ আছে। কিন্তু যিনি যাই লিখবেন তাই কি সাহিত্যের মর্যাদা পাবে? তাছাড়া যেমন-তেমন সাহিত্য হলেই কি কালজয়ী হয়? সাহিত্যে 'থেকে যাওয়া' আর 'মুছে যাওয়ার' ব্যাপারটা বড়োই নির্মম। সকলের লেখা থাকে না, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। যা থাকে তাই নিয়েই তো ইতিহাস লেখা হয়। অবশ্য হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে বার করাও ইতিহাসেরই কাজ। সাহিত্যের ইতিহাসেও এমন নামই বেশি যার অন্য সব কিছু হয়তো পুরোই হারিয়ে গেছে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া জিনিষের জন্য খোঁজাখুজির মূলেও থাকে উৎকর্ষের সন্ধান -search for excellence। এই excellence বা উৎকর্ষের ধারণাটি কিন্তু ধরাবাঁধা কিছু নয়, তা অবশ্যই আপেক্ষিক, অপেক্ষাকৃত ভালো কিংবা মন্দের বিচার। অর্থাৎ excellence এর সন্ধান comparative study বা তুলনামূলক অধ্যয়ন ও চর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। আর প্রায় সমকক্ষ দুই বস্তুর মধ্যেই তুলনা হয়, হাতির সঙ্গে শেয়ালের তুলনা হয় না। এই জন্যে সাহিত্যে genre শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যের যে বিভাজন কাব্য নাটক ইত্যাদি, সেটা নিতান্ত স্থূল বহিরঙ্গের ব্যাপার।

আমরা কালানুসরণ থেকে genre এ এসে পড়েছি। genre হলো জীববিজ্ঞান থেকে ধার করা শব্দ। বাঘ আর বিড়াল একই genre এর অন্তর্গত। সাহিত্যের genre এত স্পষ্ট বিভাজন নয় তবে জাতি-গোত্রের ধারণা থেকেই কথাটা তুলনামূলক সাহিত্য বিচারে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের নিজস্ব যে শৃঙ্খলা তাতে রচনাটির জাতি-গোত্র নির্ণয় অবশ্যই একটা বড়ো জায়গা জুড়ে থাকে। এই রকম, আরো একটা বিষয় হলো সাহিত্যের form and content, আধার এবং আধেয়ের নবায়ন এবং দেশান্তর গমন। রোমান্টিকতা ইংরেজী সাহিত্য থেকেই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল। সুফী সাহিত্য ইরান থেকে পূর্ববাংলার ধর্মনিরপেক্ষ প্রেমগাথাগুলিতে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলা গদ্য কবিতাও ইংরেজী সাহিত্য থেকেই এসে পড়েছিল। তাহলে সাহিত্যের ইতিহাস কেবল chronology বা কালানুসরণ নয়। তা ব্যক্তি–প্রতিভার উৎকর্ষের সন্ধান, তৌলন বিচার, রচনার জাতি-গোত্র নির্ণয়, সাহিত্যের আধার এবং আধেয়ের নবায়ন ও দেশান্তর গমন সম্বন্ধে অনুসন্ধান, সাহিত্যের যুগান্তকারী ঘটনাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আসল সমস্যা বা সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে হিস্টরিওগ্রাফীর সমস্যা। কেন আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যের নিজস্ব শৃঙ্খলা অনুযায়ী সাজাব না? কেন আমরা পূর্বজদের জাত্যাভিমান ধর্মমোহ এবং অদূরদর্শী রাষ্ট্রিক ভাবনার দ্বারা এখনো, এতদিন পরেও, বাঁধা পরে থাকব? এ সমস্যার কী সমাধান হতে পারে?



।। ছয় ।। সমাধানের উপায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যাগুলি কোথায় কোথায় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে তা জানবার পর অবশ্যই জানতে ইচ্ছে করবে এগুলির সমাধানের কোনো উপায় আছে কিনা। সমস্যাগুলিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে দেখা হয়েছে- (ক) প্রথম হলো তথ্যের সমস্যা, (খ) দ্বিতীয় হলো হিন্দু-মুসলমান ভেদ অর্থাৎ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের সমস্যা, (গ) তৃতীয় সমস্যাটি হলো রাষ্ট্রিক পরিচয়ের সমস্যা, (ঘ) চতুর্থটিকে বলা যায় দৃষ্টিকোণের সমস্যা বা হিস্টরিওগ্রাফীর সমস্যা। এই চতুর্বিধ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এ বিষয়ে একটির পর একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন এবং খোলামেলা আলোচনা। পারস্পরিক মত বিনিময় যত বেশী হবে ততই মতবিরোধের ক্ষেত্রগুলি সংকীর্ণ হয়ে আসবে, মনে হয়। এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয় তাদের সকলের। প্রয়োজনে দু-তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থ সাহায্যে (দুই বাংলাতেই U.G.C. আছে) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নব প্রতিষ্ঠিত বাংলা বিদ্যা সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে প্রতিবছরই বিষয়টি উত্থাপিত হতে পারে। মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাবিদ্যাসম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনের একটি অ্যাকাডেমিক সেশন এ বিষয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল।

তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয় নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে তা চূড়ান্তভাবে সমাধান করতে হলে আরো প্রাসঙ্গিক তথ্য চাই। নতুন তথ্য চাই। সেজন্যে ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় সমস্ত পুথি, যা এ পর্যন্ত গবেষকদের নাগালের মধ্যে এসেছে সেগুলির পরিপূর্ণ বিবরণ এবং যথাযথ সম্পাদনা ও প্রকাশনা চাই। নতুন উৎস খুঁজে বার করা চাই। প্রাচীন পুথির ভান্ডার নেপাল, লাডাক এবং হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধান করা চাই। এজন্য বড়রকমের পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ও নেতৃত্ব চাই. চন্ডীদাস সমস্যা, কৃত্তিবাস সমস্যা, কাশীরাম সমস্যা, মুকুন্দ সমস্যা ইত্যাদি অনন্তকাল ধরে সমাধান হবেনা- একথা মেনে নেওয়া যায় না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের সমস্যা আসলে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণের সমস্যা, তথ্যনিষ্ঠার সমস্যা, সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সমস্যা। আগামী একবিংশ শতাব্দীতেও কি আমরা এ ব্যাপারে সাবালক হতে পারব না? পৃথিবীর অন্য সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করলে, মিলিয়ে নিলে সম্ভবত সংকীর্ণ মনোভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আর তাহলেই বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস রচনার ব্যাপারে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

## টীকা

১। নীহার রঞ্জন রায়- *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, ১৯৪৯, কলকাতা।

২। সমরেন্দ্র নাথ সেন- *বিজ্ঞানের ইতিহাস, দুখন্ড* ১৯৫৫, ১৯৫৮, কলকাতা।

৩। Albert Weber-*History of Indian: Literature*. Isted-1852. English Translation 1875 London.

Friedrich Maxmueller- *History of Ancient Sanskrit Literature*, 1859, London.

A.A. Macdonell- *History of Sanskrit Literature*, 1900, London.

A.B. Keith- *History of Sanskrit Literature*, 1928, Oxford.

M. Winternitz-*History of Indian Literature*. Vol I-1929, Vol II-1935, Vol III- 1959.

৪। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর-*সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব*, ১৮৫৩, কলকাতা।

৫। রামগতি ন্যায়রত্ন- *বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, ১৮৭৩, ২য় সং. ১৮৮৮, চুঁচুড়া।

৬। ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত- *ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবি জীবনী*, ১৯৫৮, কলকাতা।

৭। দীনেশ চন্দ্র সেন- *বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য*, ১৮৯৬,কলকাতা।

৮। সুকুমার সেন- *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৫খন্ড, প্রথম খন্ড প্রথম সং- ১৯৪০, কলকাতা।

৯। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খন্ড প্রথম সং- ১৯৫১, ৭ খন্ডে, কিন্তু তৃতীয় খন্ড দুই পর্ব এবং ষষ্ঠ খন্ড দুই পর্ব মোট ৯ খন্ড, শেষ সংস্করণটি প্রথম খন্ড ও তৃতীয় খন্ড দ্বিতীয় পর্ব -১৯৯৫, কলকাতা।

১০। গোপাল হালদার- *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*, দুইখন্ড, ১৯৫৪, ১৯৫৮, কলকাতা।

১১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*, আদি- মধ্য- আধুনিক যুগ, ১ম সং. ১৯৫৯, কলকাতা।

১২। ভূদেব চৌধুরী- *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম পর্যায় ১ম সং ১৯৫৪, দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৮৪, তৃতীয় পর্যায়, প্রথমার্ধ-দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৮৭।

১৩। সুকুমার সেন- *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, ১৩৫৮, কলকাতা।

১৪। মুহম্মদ এনামুল হক- *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, ১৯৫৭, ঢাকা।



১৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ- *বাংলা সাহিত্যের কথা*, দুখন্ডে, ১৯৫৩, ১৯৬৫, ঢাকা।

১৬। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান- *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১৯৫৬, ঢাকা।

১৭। আহমদ শরীফ- *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, দুখন্ডে, ১৯৭৮ এবং ১৯৮৩, ঢাকা।

১৮। আনিসুজ্জামান- *পুরোনো বাংলা গদ্য*, ১৯৮৪, ঢাকা।

১৯। সবিতা দাস (চট্টোপাধ্যায়)- *বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক*, ১৯৭২, কলকাতা।

২০। Muhammad Shahidullah-*Les chants mystique de Kanha et de Saraha*. 1928, Paris.

২১। Suniti Kumar Chattopadhyay-*The Origin and Development of Bengali Language*. 1926, Calcatta.

২২। সুকুমার সেন-*চর্যাগীতি-পদাবলী*, তৃতীয় সং- ১৯৭৩, কলকাতা এবং দ্রষ্টব্য- *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ১২ শ সং- ১৯৭৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৩-দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং পাদটীকা এবং তৎসহ-১৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

২৩। তারাপদ মুখোপাধ্যায়- *নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন*, ১৯৯৩, কলকাতা।

২৪। সতীনাথ ভাদুড়ি-উপন্যাস ঃ *জাগরী* (১৯৪৬), *টোঁড়াই চরিত মানস* (প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ ঃ ১৯৪৯, ১৯৫১), *অচিন রাগিনী* (১৯৫৪), *সংকট* (১৯৫৭), *দিগভ্রান্ত* (১৯৬৬) ইত্যাদি।

২৫। Munier Chowdhury-"The Language Problem in East Pakistan." *International Journal of American Linguistics*. July-1960.

২৬। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, ১ম সং-১৩৭৩, সংশোধিত ৭ম সং-বৈশাখ, ১৩৯২। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট- পৃ. ৯-২৪।

ঋণ স্বীকারঃ এই টীকা ও পঞ্জী তৈরিতে আমাকে সাহায্য করেছেন গ্রন্থাগারিক বন্ধু তরুণ পাইন এবং অজয় চৌধুরী এবং অধ্যাপক বন্ধু বীতশোক ভট্টাচার্য।

# বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ভাবনা ও প্রযোজনা

ভূদেব চৌধুরী

সাহিত্যের ইতিহাস কেবল ইতিহাস নয়; সাহিত্য এবং ইতিহাসের রাসায়নিক যুগলমিলন। সাহিত্য জীবন-সম্ভব; জীবনের রচয়িতাও। ইতিহাস জীবনের পরিচয়-সন্ধানী; অনুপুঙ্খ তথ্য আহরণের মানচিত্রে জীবনের চলার পথের দিশাটি সে ধরতে আগ্রহী।

জীবনকে ঘিরেই মানুষের চিরকালের সকল কৌতূহল; সকল উদ্বেজনাও। রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন, জীবন মানুষের 'পড়ে পাওয়া ধন'। গঠনের শুরুতে, এবং পরেও, তার ওপরে মানুষের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না; নেই। তাই জীবন নিয়ে মানুষের তৃপ্তি নেই একেবারেই; আর সেই অতৃপ্তি মোচনের আগ্রহে মানুষ আপন 'মনের মতো' করে জীবন গড়তে চায় বিবিধ কলাকর্মে, – সাহিত্যেও[১]।

অপর পক্ষে, জীবন কেবল মানুষের অধিকার-সীমার বাইরেই নয়, তার জানাশোনার সীমারও বাইরে; দুরপনেয় রহস্যে ঢাকা। মানুষের জ্ঞানের জগৎ, তার দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস, সেই রহস্যের জট খুলতে প্রাণপণ করে; নানা পথে ও মতে। তারই মাঝে ইতিহাস, বহমান জীবনের ক্রমিক সংঘটনের তথ্যমালা অনুপুঙ্খ সংগ্রহ করে, পূর্বাপর গেঁথে, জীবনের চলার পথের প্রাঞ্জল দিশাটি ধরতে চায়।

সাহিত্য মানুষের উদ্ভাবনী সামর্থের পূর্ণায়ত সামগ্রিক সৃষ্টি। আর, ইতিহাস সকল সৃজন-প্রকরণেরই সময়, পরিবেশ ও অবস্থানের বিচ্ছিন্ন উপকরণ-সব একের পর এক সংকলন করে অন্তর্নিহিত রহস্যটির একটা বোধগ্রাহ্য অবয়ব গড়তে চায়। দু-এর সঠিক যোগাযোগ ঘটতে পারলে অভাবনীয় কলাকুশলতার একটা অনুভবনীয় মাত্রা মুঠোর সীমায় চলে আসতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসের দায়, তাই, অভাবনীয় সৃষ্টির রহস্যকে অনুভবনীয়তার প্রাঞ্জল পরিকাঠামোয় উদ্ভাসিত করতে পারার।

সে পথে গ্রন্থি অনেক। সাহিত্যের উৎসার, রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরেও, বস্তুস্তরণের অন্তঃপ্রেরণায়। আর ইতিহাসের প্রকরণ, সবটাই, বস্তু-নির্ভর; একান্তভাবে তথ্যসমাহারী।



দুয়ের যোগাযোগে সেই ভারসমতার বিন্দুটিতে পৌঁছানো কঠিন হয়, যেখানে বস্তুর বিন্যাস ও ব্যঞ্জনার সূত্র ধরেই বস্তুকে উত্তীর্ণ হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় সৃষ্টি-সংবেদনের প্রাঞ্জল অনুভাবনা-লোকে।

বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গেই আসি যদি, ইতিহাসের তরফ থেকে সমকালীন রচনার নিরীক্ষণের চাহিদা প্রথম অনুভব করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মুখ্য কবিওয়ালাদের সঙ্গে ভারতচন্দ্র–রামপ্রসাদেরও জীবনকথা, এবং রচনা-পরিচয়ও, তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। প্রত্নমূল্য সংরক্ষণের আগ্রহেই তাঁর প্রধান প্রেরণা ছিল। অনেক পরিশ্রমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত তথ্যের পরে তাঁর আলোচিত কবিওয়ালাদের অনেকের সম্পর্কেই নুতন তথ্য কিছু পাওয়া যায়নি আর। যথাকালে তিনি সচেষ্ট না হলে অনেক তথ্য খোয়া যেত, অনেক তথ্যে জট পাকিয়ে যেত; যেমন গেছে বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাস, রামায়ণ-কবি কৃত্তিবাস, কিংবা আরো অনেক পুরোনো কবিদের ক্ষেত্রে। সংশ্লিষ্ট কবিদের 'জীবনচরিত প্রকাশ' করে ইশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, এ ধরনের প্রকাশচেষ্টার কী যে ফল তাও তাঁর পূর্ববর্তীরা জানতেন না। সে ফল যে সঠিক কেমন, ঈশ্বচন্দ্রেরও অবধানে তা পুরো পৌঁছোয় নি, সেই প্রাথমিক প্রয়াসের উপলক্ষে।

তথ্য সমাহরণে ইতিহাসের ঐকান্তিক একাগ্রতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ জীবনের 'সত্য' সন্ধানের প্রসঙ্গ উথাপন করেছিলেন। তাঁর ভাবনায়, কবির 'প্রতিভা-বলে কাব্যেই' তা 'উদ্ভাসিত' হয়ে ওঠে। ইতিহাসের 'তথ্যস্তূপ' থেকে 'যুক্তি ও কল্পনা বলে সত্যকে উদ্ধার' করে নেবার পন্থাটিও, একই প্রসঙ্গে, তিনি নির্দেশ করেছিলেন[২]। ভাবতে ইচ্ছে করে, ঈশ্বরগুপ্তের সংগৃহীত তথ্যাবলীর সূত্র ধরে তার ভেতরকার 'সত্য'-সার রবীন্দ্রনাথই উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলেন 'কবি সংগীত' প্রবন্ধে।[৩]

আসলে, বিশেষত-তথ্যজীবী ইতিহাসও জীবনসত্যের দিশারি নয় কেবল, সন্ধানীও। ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রমসাধ্য তথ্যরাজি উপস্থিত না থাকলে রবীন্দ্রনাথের 'সত্য' সঞ্চার অসম্ভব হত। শুধু তাই নয়, একেবারে শুরুর সময়ের রাজকীয় প্রসঙ্গের বেড়া ভেঙে, ইতিহাস ক্রমে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতির নানা সমস্যার জিজ্ঞাসুতা ছাপিয়ে, ইদানীন্তনকালে 'মানুষের চৈতন্য ও বিশ্বাসের নানা জটিলতা'র গহনে আপন সন্ধানী দৃষ্টিকে বিস্তারিত করতে চাইছে বলে একালের বিশেষজ্ঞরাও দাবি করেন[৪]। দীর্ঘদিনের বহমানতার টানে আজ যে অনুভব স্বচ্ছ, আসলে, বরাবরই, তাই ছিল ইতিহাস-স্বভাবের মজ্জাগত। জীবনের একটি ধারাচরিত্রকে স্থায়ী আকার দেওয়া। ঐতিহ্যের সূত্রটি,- জীবনযাত্রার বিশেষিত একটি পূর্বাদর্শ, যা পরবর্তীদের সামনে হাজির হয়ে থাকে। সেই

একই খাতে না হলেও, তার চৌহদ্দি ঘিরে অনুবর্তী জীবনের প্রবাহী বিকাশ-বিবর্তনের দিশে সংগ্রহ করতে যদি পারা যায়!

ইতিহাসের উদ্দেশ্য নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এদেশে তাত্ত্বিকদের কাছে শোনা যায়, 'রামায়ণ'এর ইতিহাস পাঠের ফলে জানা যেতে পারে, 'রামাদি'র মতোই আচরণ করতে হয়, 'রাবণাদি'র মতো নয়। একথা নীতিশাস্ত্রের। ইতিহাস সমুচিত তথ্যের সমাহারে এই দুটি বিপরীতমুখী জীবন-চরিত্রকে কেবল উপস্থাপিত করে রাখে, যথাযোগ্য অবধানের জন্য। এ কেবল জীবন-চিত্রণ নয়, এক রকমের জীবন-আবিষ্কারও; শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনেছি মানুষের যে জীবনাগ্রহের কথা। এর সবটুকুই বস্তুঘনিষ্ঠ, বস্তু-নির্ভর। সাহিত্য, বলেছি, বস্তুরণ-প্রত্যাশী-প্রায় সর্বত। তাই প্রথমটির নিকষে দ্বিতীয়টিকে যাচাই কী করে করা চলে?

জীবনের একেবারে অন্ত্যসীমায় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' কেবল অসম্ভব নয়, অসঙ্গত – ও; মনে হয়েছিল তাঁর। নিজের দিকে চেয়েই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন, তাঁর আবাল্যের প্রকৃতি-সমুৎসুকতা, যা কেবল তাঁরই একক অন্তঃপ্রবণতাও, এবং যার টানে পল্লীবাংলার প্রথম সংসর্গেই উদ্বারিত হয়ে গিয়েছিল 'গল্পগুচ্ছ'-র অবাধ উৎসার, তার সবটুকুই তো তাঁর আপন ধন! ইতিহাস তার খেই ধরবে কোথায়?[৫]

মানতেই হবে, সাহিত্য, তথা শিল্পমাত্রই, শিল্পীর, সাহিত্যিকের, নিমগ্ন আত্মরচনা। জীবনকে নিয়ে ব্যক্তি-শিল্পীর যে নিজস্ব কৌতূহল, তাকেই আপন অভিজ্ঞতার ঘোরপাকে নিঙড়ে যে জীবন-সার–যে নির্যাস, তিনি নিজের ভেতরে আহরণ করেন, তাকেই নিগূঢ় অর্ন্তমন্থনে উৎসারিত করে বৃহৎ জগতের কাছে পৌঁছে যেতে হয়ই তাঁকে। ওইটুকু স্রষ্টা ব্যক্তির আন্তরিক দায় অনিবার্য আত্মিক গ্রন্থি। একের ভাবনাকে অনেকের অনুভাবনা রূপে সঞ্চারণেই শিল্প-সাহিত্যের রস–মোক্ষণ।

এদিক থেকে সাহিত্যর স্বাদুতা আসলে সাহিত্যিকের আত্মউৎসারণেরই চরিত্র – চিহ্নিত। আর সাহিত্যের ইতিহাস আসলে সৃষ্টির গভীরে স্রষ্টাকেই খোঁজে; খোঁজে তাঁর জীবন-পরিবেশের টানাপোড়েনে সম্ভাবিত আত্ম-উন্মোচনের দিশেটি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তথ্য-বিন্যাসে এগোতে হয় তাকে। যা-কিছু-সব তথ্য উজাড় করে দিয়ে কিছু হয় না।

রবীন্দ্রনাথ যে উন্মুখ প্রকৃতি-সমাগ্রহকে তাঁর একক বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র বলে দাবি করেছিলেন, ইতিহাস খোঁজ করে বলবে, তারও কারণ রয়েছে। তাঁর আবাল্য নিঃসঙ্গ



উপেক্ষিতমনস্কতা। সুবৃহৎ পরিবার জোড়া অনেক মানুষের মাঝখানে থেকেও মানুষের সঙ্গ তিনি পাননি। বড়োদের কাছে উপেক্ষিত হয়ে পড়ার নানা বিবরণ রয়েছে *জীবনস্মৃতি* তে; চূড়ান্তটি আছে 'বাহিরে যাত্রা' অধ্যায়ে। বড়োদের সঙ্গ ধরে এগোবার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যেতেই মন কেমন 'পালতোলা নৌকায় বিনাভাড়ার সওয়ারি' হয়ে বসেছিল[৬]। আর স্বভাবজাত বড়োমি শিশুকাল হতে ছিল তাঁর মজ্জায়। সমবয়স্ক ছোটোদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে না পেরে একা একা কেমন পায়চারি করে বেড়াতেন, সুযোগ পেলে, বড়োর ভূমিকায় কেমন ওই ছোটোদের খেলার দলে ভারিক্কি চালে বক্তৃতা করতে এসেছিলেন, তার কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ।[৭]

ওই সব সত্য একত্র সংগ্রহ করে ইতিহাস ধরিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের আবাল্য অসামান্য প্রকৃতিপ্রেমের উৎসটি। আর সে যে নিপাট তৃপ্তিবিধায়ী ছিল না, মানব-সঙ্গহীনতার বেদনা যে তার মর্মে জমেই থাকত, তার সৃষ্টিজ প্রমাণ প্রথম সুযোগেই ধরা পড়ে গেল, বয়ঃসন্ধির দেহলিতে বহমান কাব্যধারা একটিমাত্র ছত্রে, 'মানুষের মন চায় মানুষেরি মন'।[৮] এই কবিতা-পংক্তি রবীন্দ্র-সৃজনধারায় অনন্য দিগ্‌দর্শী এক স্তম্ভ। আপন সংগৃহীত তথ্যক্রমের মাধ্যমে ইতিহাসই তার রহস্য-পরিচয় উন্মোচিত করে দেয়।

কিংবা পল্লীবাংলার সহচারিতায় উৎসারিত গল্পস্রোতের গহনেও যে অসামান্যতা রয়েছে, তারও মূলে আছে কবি-ব্যক্তিত্ব, আর বিশেষিত এক জীবন-পরিবেশের আদান-প্রদানের অন্তঃক্রিয়া। ইতিহাস তার রহস্য উদ্ঘাটনের পথ ধরিয়ে না দিলে *হিতবাদী* যুগের 'পন্ডিত' প্রতিরোধীদের প্রতিক্রিয়া উত্তীর্ণ হয়ে এই অপূর্ব গল্প–সৃষ্টি আপন ভূমিকাটি খুঁজে নিতে বাধা পেতে পারত।

তবু রবীন্দ্রনাথের আপত্তিটা ছিল ইতিহাসের তথ্যাতিশয্যের বিরুদ্ধেই। তাঁর রচনা-বিবেচনায়, এখনকার সমালোচকেরা যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অন্তত বারো আনা পরিমাণ আমি জানিইনে। বোধকরি সেই জন্যেই বিশেষ করে আমার রাগ হয়'।[৯] ওইখানেই আসলে গ্রন্থি। ইতিহাস তথ্যজীবী, কিন্তু তথ্যমাত্র-সর্বস্ব নয়। প্রত্ন-উপাদান ইতিহাসের অনিবার্য উপকরণ; কিন্তু প্রত্নতথ্যই ইতিহাস নয় কখনোই। ইতিহাস গড়বার জন্যে, জীবনের ঐতিহ্যরূপ ধরে দিতে, কোন্ উপাদান কতটুকু প্রয়োজন হবে, জানা নেই। তাই নির্বিচারে এবং নিঃশেষে সকল উপাদান আহরণ করে নিতেই হয়। তার পরে আসে বিন্যাসের প্রসঙ্গ; ঝাড়াই বাছাইয়ের প্রয়োজন। বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে; সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে। শাজাহান ক্ষমতালিপ্সু সৌন্দর্য্য-বিলাসী প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন। অনেক যুদ্ধজয়ের সঙ্গে ময়ূরসিংহাসনাদির সমসূত্রে

চূড়ান্ত ধাপে তাজমহলও তিনি তৈরি করিয়েছিলেন। এসব ইতিহাসের সংগৃহীত তথ্য। কিন্তু শাজাহান ব্যক্তিটির অন্তঃসত্য খুঁজব কোথায়? সেদিনের ইতিহাস সে খোঁজ করেনি। ওইখানে ইতিহাসের তথ্য-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নালিশ। সে অভাব তিনি কবিতায় পরিপূরিত করে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির কোন পরিচয় তাজমহলের পক্ষে 'সত্য'? (১) 'এক বিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'।[১০] অথবা, (২) 'প্রেমের রহস্যে কিন্তু একান্ত বঞ্চিত, ছায়ামায়াশূণ্য তব হৃদয়-কন্দর'।[১১]

ওইখানে সাহিত্যের ইতিহাসের ভূমিকা। তাজমহলের বস্তু-রূপ ছাপানো, বস্তুত্তর যে সৌন্দর্যমহিমা, তার উন্মোচনে দুই কবির অনুভবই অকুণ্ঠ; পরস্পর-বিরোধী হলেও দুই-ই সমান পরিমাণে সাহিত্যের 'সত্য'। সম্রাট শাজাহানের নির্মাণ নয়, তাকে ঘিরে যুগল কবি-হৃদয়ের উৎসার-মন্থিত 'নির্মিতি' নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দুটি কবিতায় অনন্য। সেই অনন্যতার প্রেরণা-পরিচয় ইতিহাস গড়ে দেয়, দুই কবি -চৈতন্যের সমুচিত, সুপরিমিত তথ্যের আবহে। ইতিহাস গড়তে, বিশেষ করে সাহিত্যের ইতিহাস গড়তে, তথ্য বিন্যাসের ওই ঔচিত্য ও পরিমিতি নির্ধারণই আসল কথা। এও এক ধরনের 'নির্মিতি', নিছক 'নির্মাণ' নয়।

পুরোনো বাংলা সাহিত্যের প্রায় কোনো তথ্যই সমসময়ে ধরে রাখা হয়নি একটা সময় পর্যন্ত। সে প্রয়োজনবোধই ছিল না তখন। পরবর্তী সময়ের ইতিহাস সন্ধানে, তাই, তথ্য-উপাদান সংগ্রহের প্রতিই একাগ্র-একান্ত ঝোঁক পড়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলির কবি চন্ডীদাস কয়জন ছিলেন, কে কবে আবির্ভূত হয়েছিলেন চৈতন্যের আগে-পরে, এইসব খুঁটিনাটির খোঁজে অপূর্ণ-অস্পষ্ট তথ্যের ভাঁজ খুলতে অনুমান আর বিতর্কের উত্তাপ যতই বাড়তে লাগল, তার তলায় চাপা পড়ে গেল আসল সাহিত্যিক জিজ্ঞাসাই ঃ কবিতাগুণের মান-পরিমাণ, তার উৎসগত জীবন-প্রেরণার স্বকীয় চরিত্র, আর তার অভিব্যক্তির বিশেষ ধরণ। সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে সৃষ্টির গঠন-রহস্যের এই চাবিকাঠিটিই ধরে রাখবার কথা। অর্থাৎ, বড়ু চন্ডীদাস *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* -এ যে-কাহিনী যেভাবে গড়লেন, আর চন্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া চৈতন্য-ভাব-নির্মুক্ত বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়, বিন্যাস এবং সার্বিক আবেদন কেন আমূল পৃথক হয়ে যায়, সেই রহস্যের গ্রন্থি সন্ধান, গ্রন্থি মোচন করতেই সাহিত্যের ইতিহাসের ভূমিকা।

তার বদলে, বাংলা 'রামায়ণ'-এর আদিকবি কৃত্তিবাস কোন 'গৌড়েশ্বর'-এর সভায় কবে সংবর্ধিত হয়েছিলেন, তাই নিয়ে তর্কের হিড়িকে কবির সৃষ্টির বিবেচনাই অন্তর্হিত হয়ে যদি যায়, তাহলে ঝিনুকের কণিকা ভেঙে তার মাত্রা-পরিমাণ যাচাই করতে



ভেতরকার মুক্তোটি অঝোরে ঝরেই যায়। প্রত্নতথ্য ইতিহাসের ভূমিকাকে আড়ষ্ট করে দেবার এই আতিশয্যের বিরুদ্ধেই ছিল রবীন্দ্রনাথের আপত্তি।

স্পষ্ট করে বুঝতে হয়, সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাকে জ্ঞানের সীমায় ধরতে চায় নন্দনশাস্ত্র; ভাব, রূপ, রসের মান-পরিমাণ নিয়ে তার যুক্তি-বিচার-বিবেচনার বিতর্ক। সাহিত্যের ইতিহাস সাহিত্যকে ধরতে চায় জীবনের নিরিখে। যে-জীবনকে সাহিত্যের শিল্পী আপন সাধনায় পুনঃসৃষ্টি করলেন, তারই সূত্রটি খুঁজে দেয় সাহিত্যের ইতিহাস। প্রত্যক্ষ এক জীবন থেকে কী করে আরো একটি মনোহর জীবনের অরূপ অপরূপ মাত্রা উৎসারিত হয়ে যায়, তারই রহস্য। তথ্যকে ধরে তথ্যাতীত, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'সত্য',-তারই কাছে পৌঁছে যাবার দিশে। তার বদলে, তথ্যের ঘোরপাকে চক্রাবর্তিত হয়ে ফিরলে ইতিহাস ব্যর্থ হয় সাহিত্যের সত্যকে ধরতে। তখন সে নির্জীব প্রত্নতালিকা।

অপেক্ষাকৃত চেনাশোনা সময়ের সীমানায় চলে আসা যায় যদি, অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র রায় আর রামপ্রসাদ সেন, দুই সমকালীন কবি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবর্তনায় দুটি *বিদ্যাসুন্দরকাব্য* রচনা করেছিলেন। অথচ কেবল রচনাগুণে নয়, রচনা-চরিত্রেও দুটি কাব্য কেমন দুস্তর পৃথক হয়ে গেল! অন্য পক্ষে নিষ্প্রভতর *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যের কবি রামপ্রসাদ শাক্ত-সংগীত রচনা করে কেমন কালজয়ী হয়ে আছেন?- সর্বজন মনোহর! এমন কেন হয়? সে কী কেবল কবি-দুজনের ব্যক্তি-স্বভাবের পার্থক্যে, একজন বিদগ্ধ, আর একজন সাধক-কবি বলে? এ সমীকরণ হয়ত অতি-সরল হয়ে পড়ার ভয় আছে। ভারতচন্দ্রের রচনায় চাকচিক্যময় 'কারুকার্য' আর 'উজ্জ্বলতা'র প্রখর আলোর তলায় পরিপার্শ্বগত জীবন কেমন আবছা হয়ে যায়, প্রদীপের তলার অন্ধকারের মতো। আর রামপ্রসাদের ভক্তিতদ্‌গত মনের রচনা গানে-কবিতায় সমকালীন আর্থসামাজিক জীবনের অবক্ষয়িতার আক্ষেপ কেমন মর্মরিত হয়ে ওঠে! বহমান গোটা জীবনের বেদনা। তার কারণ খুঁজব কোথায়? সেই রহস্যের মধ্যেই তো নিহিত রয়েছে সমর্থ দুই কবির সৃষ্টির মাপছুট মান-পরিমাণ।

ইতিহাস, এইখানে, আপন তথ্যপঞ্জীর হিশেব খুলে, সমুচিত উপকরণের ডালায় সাজিয়ে, অনুসন্ধেয় রহস্যটির দিশে ধরিয়ে দিতে চায়। রাজসভার কবি, নাগরিক কবি, ভারতচন্দ্র অনেক ঝঞ্ঝার ঝাপটা পুইয়েছিলেন সারাজীবন; তবু ওই ঝড়ের আঁধিতেই চারপাশের জীবনের দিকে তাকাবার সুযোগই ঘটেনি তাঁর মনের; আর স্থিত হয়ে বসলেন যেদিন কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়, নাগরিকতার একচক্ষু আলোয় জীবন, দেশজোড়া গ্রামীণ

জীবন, তখন, কত দূরে চলে গেছে! রামপ্রসাদ গ্রামের শিল্পী ছিলেন, জীবনকে তিনি পেয়েছিলেন চোখে দেখে নয় কেবল, প্রতিমুহূর্তের জীবন-যাপনে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। তান্ত্রিক কালীসাধক কবির ভাব-সংগীতে সাধনার কথা, দেবীর কথা ছাপিয়ে, 'পান বেচে' খাওয়া 'কৃষ্ণপান্তি'র ছবি কেমন ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে, সামাজিক অবক্ষয়িতার প্রতীকায়িত মূর্তিতে। কিংবা আগমনী-বিজয়ার গান!

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাংলাদেশ 'গ্রামে গাঁথা'। আসলে বাঙালির জীবনও গ্রামীণ সমাজ জুড়ে। বিদ্যাপতির শিবসিংহ-লছিমাদেবী থেকে ভারতচন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত রাজসভার ভোগ-বিলাস-ব্যসন, সমাজে থেকেও সমাজ-ছুট। আর আজ-উনিশ শতক-উত্তর বাঙালির সাহিত্য সবটাই যে নাগরিকতা-সম্ভব, তার মূলটাই দেশের শেকড়-ছেঁড়া। বিদেশী শিক্ষা-সম্পদের জ্ঞাত-অজ্ঞাত আভিজাতিক বিভাজনের টানে জীবনের দেশীয় চরিত্র সেখানে আচ্ছন্ন, গ্রামজীবন আজ আমাদের সাহিত্যে অন্য দেশের জীবন। 'লোকসাহিত্য' নামে বিভাজিত সৃষ্টির জীবন! তার ফলে, পূর্ব-পশ্চিম বাংলায় নয় কেবল, ভারত-উপমহাদেশ জুড়ে জীবনের আক্ষেপ, আক্রোশ, বিচালন আজ অনিবার্য হয়ে ফিরছে। ইতিহাস তারও হিশেব ধরতে পারত। কিন্তু এখানে সে আমাদের প্রসঙ্গ এবং অধিকার-সীমার বাইরে।

কেবল বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালেই তর্জনী-সংকেতটি স্পষ্ট হতে পারে ইতিহাসের। উনিশ শতকের নাগরিকতাচ্ছন্ন সাহিত্য যখন 'আধুনিক' চরিত্রের অধিকার আয়ত্ত করছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে জীবন-চরিত্র-চিত্রণের ঋত্বিক। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালি জীবনের, তখনো অস্ফুট, সংকট-জটিলতা-গ্রন্থির উদ্ভাবন ও উদ্ভাসনে নিমগ্ন। তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এলেন প্রতিবাদীর ভূমিকায়; বিদেশী সাহিত্যের আদলে গড়া জীবনচ্ছবির বিপরীত কোটিতে দেশীয় জীবন, গ্রামের জীবন গড়বার দাবি নিয়ে। কিছু কিছু টুক্‌রো ছবির নক্‌সা কাটা হল, গোটা জীবন সংহত হতে পেল না তাতে। আর তারকনাথও তো আসলে ছিলেন বঙ্কিমেরই দলে, দেহেমনে প্রাণে ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালি। অতএব, সরলা-কথার প্রাথমিক নক্‌সা-কাহিনী ছাপিয়ে শেষ অবধি স্বর্ণলতা-উপকথা তো টপকে চলে এল শহরে। উদ্দেশ্য যেখানে বিতর্ক-সাধিত, জীবনের স্ফুরণ সেখানে বাধাহত, ঊষর।

এরই মাঝে এলেন মীর মশাররফ হোসেন; কবি রামপ্রসাদের সগোত্র; নুতন সময়-সংকটের পৃষ্ঠপটে। গ্রামের মানুষ, গ্রামের পটভূমিতে প্রোথিত-জীবন। লিখেছেন গদ্যে, পদ্যে; উপন্যাস-নাটক-কবিতা। কিন্তু জীবনের হাত ধরে চলেছে কথা; জীবন অর্থে গ্রামীণ বাঙালি জীবনের নিবিড়তা। "গাজি মিঞার বস্তানি" রচনামূল্যে যদি পৃথক এবং



অনন্য হয়, তার উৎসে রয়েছে জীবন-মূল্যচেতনার পার্থক্য আর অনন্যতা। "স্বর্ণলতা"র সঙ্গে প্রতিতুলনায়, কিংবা বঙ্কিম-উপন্যাসের সমান্তরাল ধারায় মিলিয়ে পড়লে সে স্বাতন্ত্র্য, সে অনন্যতা মোহিত করে। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিনের সমুদ্ভূয়মান নাগরিক জীবনের আত্ম-প্রতিকৃতি আবিষ্কারে সমর্পিত; তারকনাথ সেই নাগরিক জীবনের অলিন্দে বসে গ্রামাভিমুখিতার আসঙ্গ-বিভোল; আর মীর মশাররফ হোসেন নাগরিকতা-প্রক্ষেপিত ভঙ্গুর গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ গাথাকার। প্রায় সমকালীন এমনি তিন শিল্পীর রচনায় জীবনায়নের স্বতন্ত্রতা-পার্থক্যের রহস্য এবং স্বরূপের সন্ধানে উৎসের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারার প্রয়াসই সাহিত্যের ইতিহাসের আন্তরিক দায়। প্রাকৃত জীবনের মন্থ শেষ 'মনের মতো' জীবন-'নির্মিতি'র সারাৎসার সংগ্রহ।

প্রকৃত জীবন, তথা, শিল্পীর প্রকৃত জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সংঘটের মন্থনেই 'মনের মতো' জীবনানুভবের সঞ্চার। অতএব, ওই জীবনের মালমশলাটুকুর দিশে ধরেই এগোতে হয় ইতিহাসকে। তাহলেও, ওই সবের ভেতরে স্রষ্টা মনের নির্মাণ-কৃতির 'করণকৌশল' আয়ত্ত করতে সেই মালমশলার ব্যবহার ও বিন্যাসের যথোচিত রীতি-প্রকরণকে নির্ণীত করে নিতেই হয়। ঔইখানে ইতিহাসের পক্ষে দেখা দেয় প্রত্নতথ্য নির্ধারণ এবং বিশ্লেষণের পরিমিতি-সিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি। হালের কালেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লোকে তথ্য-সংগ্রহের প্রয়াস কিংবা প্রস্তুতি অনুপুঙ্খ হতে পায়নি। এমন কি, ত্রিশ-চল্লিশের দশকের অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরও সম্পর্কে তথ্য-বিবরণী সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি। পরবর্তীদের নিয়ে তো চেষ্টাও প্রায় হয়নি মোটে।

প্রত্ন-সন্ধানীর দায়িত্ব আসলে স্বতন্ত্র এবং মৌলিক। তাঁরই ভরপূর সঞ্চয়ের দাক্ষিণ্যের সূত্রে ইতিহাস-কার আপন জিজ্ঞাসার আশ্রয় খুঁজে পান। অথচ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস-চর্চায় প্রত্ন-সন্ধানের এই পৃথক্ দায়িত্বের ধারণাই এখনো স্পষ্ট নয়। ফলে, ঐতিহাসিক প্রত্ন-তথ্য সংগ্রাহকের ভূমিকায় জড়িয়ে পড়তে অনেক সময়ে ইতিহাসের পটভূমি আবছা হয়ে যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের জগতে কবি-ব্যক্তির পরিচয় সূচক তথ্য সংগ্রহের অতি আগ্রহ কবি-কৃতির স্বরূপ সন্ধানের প্রাথমিক প্রয়াস-টুকুকেও আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল, দেখেছি। তেমনি, একালে, সাহিত্য-শিল্পীর জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিপার্শ্বস্থ বাস্তবিক জীবনের, তার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম-সম্প্রদায়-নীতির তথ্যস্তূপের তলায়, অনেক সময়ে, সৃজ্যমান শিল্প-সাহিত্যের উৎসার প্রকরণটিই কেমন খোয়া পড়ে যায়। যে নালিশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গড়ায় তথ্য সংগ্রহের অনুপুঙ্খতার অনায়াস-স্বতন্ত্র সঞ্চরণ-ভূমিতে তথ্য-প্রযোজনা ও জীবন-ভাবনার সর্বাত্মক সমাহার-সমন্বয়ের পথই আসলে পরম সন্ধেয়।

নির্দেশপঞ্জী

১। রবীন্দ্রনাথ-দ্র. 'সত্য ও বাস্তব' ঃ *সাহিত্যের স্বরূপ* ঃ *রবীন্দ্ররচনাবলী* (বিশ্বভারতী) খন্ড ২৭, পৃ. ২৮৪

২। রবীন্দ্রনাথঃ দ্র. 'কৃষ্ণচরিত্র' ঃ *আধুনিক সাহিত্য* ঃ *রবীন্দ্ররচনাবলী* (বি.ভা.) ৯, পৃ. ৪৫৪

৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ দ্র. 'কবি-সংগীত' ঃ *লোকসাহিত্য* ঃ *রবীন্দ্ররচনাবলী* (বি. ভা.) ৬, পৃ. ৬৩২-৬৩৮

৪। রণবীর চক্রবর্তী ঃ "*প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*" ঃ *ইতিহাস গ্রন্থমালা* ২ ঃ দ্র. অশীণ দাশগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক) ঃ *সম্পাদকের ভূমিকা* পৃ. ৭

৫। দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঃ 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' ঃ *সাহিত্যের স্বরূপ* ঃ *রবীন্দ্ররচনালী*- (বি. ভা.) ২৭. পৃ. ২৮২-২৮৪

৬। দ্র. রবীন্দ্রনাথঃ *জীবনস্মৃতি* ঃ *রবীন্দ্ররচনালী* (বি. ভা.) ১৭, পৃ. ২৯১

৭। দ্র. অবনীন্দ্রনাথ ও রানী চন্দ্র ঃ *জোড়াসাঁকোর ধারে* ঃ পৃ. ৪৬

৮। দ্র. রবীন্দ্রনাথঃ "কবি কাহিনী" ঃ *রবীন্দ্ররচনাবলী* (বি. ভা. অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ. ১৪

৯। দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঃ 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪

১০। রবীন্দ্রনাথ ঃ *বলাকা* - কবিতা সংখ্যা ৭ ঃ *রবীন্দ্ররচনাবলী* (বি. ভা.) ১২, পৃ. ১৫

১১। প্রমথ চৌধুরী ঃ 'তাজমহল' ঃ *সনেট পঞ্চাশৎ* ঃ দ্র. *পুলিনবিহারী সেন* (স.) ঃ *সনেট পঞ্চাশৎ* ও অন্যান্য কবিতা", পৃ. ৮

# বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা

শ্রী সুভদ্র কুমার সেন

সাধারণভাবে সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় কিছু কিছু সমস্যা আছে। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এমন কিছু কিছু সমস্যা থাকে যেগুলি সেই সাহিত্যের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য। এই প্রবন্ধের পরিসরে আমরা দুই ধরনের সমস্যা নিয়েই আলোচনা করব। তবে এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। আমি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিনি। এবং নিকট বা দূর ভবিষ্যতে কোনো সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করব এমন কোনো পরিকল্পনাও নেই। তাই আমি যে সমস্যাগুলির কথা বলব সেগুলি সাহিত্যের ইতিহাসকারের অনুভূত সমস্যা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। ফলে আমি যে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করব সেগুলি শুধুমাত্র সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠকের সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

।। ১ ।।

সাহিত্যের ইতিহাসের প্রকৃতি বিবেচনা করলে প্রথমেই যেটা মনে হয় সেটা হল যে এটি সেই ভাষায় রচিত পুস্তকের কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত বর্ণনামূলক তালিকা অর্থাৎ Bibliography বা Descriptive Catalogue নয়। এমনকি সেই ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান লেখকের সাহিত্য-কীর্তির আলোচনাও নয়। আবার এ কথাও সত্যি যে এইসব কিছুই সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু আরো কিছু ভিন্নতর তথ্যের সংযোজনও সাহিত্যের ইতিহাসে দরকার।

সাহিত্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ যোগাযোগ আছে। উদাহরণ স্বরূপ আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের সম্বন্ধে Denis Saurat তাঁর বই *Modern French Literature 1870-1940*- এ যা বলেছেন তা তাঁর নিজের কথায় বলিঃ

"The Third Republic in France was founded during the disasters of 1870: the German invasions of France revealed two facts: that the imperial regime of Napoleon the Third was incompetent and corrupt: and that the people of France was not attached to it. The republic was in the hearts of the people; and its greatest civilizing task was the education of the people. For the first time in the history of France every village had a school; elementary but sound education was given to the whole people. The state made itself responsible for education, built school everywhere, made learning free: *'L' instruction est. gratuite, laique, obligatoire;'* all had a right to be taught without having to pay for it; religion had no place in the schools; all men and women had a duty to educate themselves. Democracy demands education.

The French language and French literature were given pride of place in the system; all French children had to be taught proper French; all had access to books; all that could pass the necessary examinations, could go on with their studies, through the Universities, and into careers, without having to pay anything True democracy was installed in the intellectual domain.

The moneyed classes looked upon this system as an unendurable attack on their privileges; it so happened that the moneyed classes were also the religious classes: a fact conditioned by the great revolution of 1789-95 and its consequences. The scholastic system of the Third Republic was looked upon by the privileged classes as a method created to destroy religion in the people–which, in some ways it was."

এই সব পরিবর্তনের ফলে শুধু যে ব্যক্তিচিত্তের মুক্তি ঘটল তাই নয় সমাজের চিন্তায় ঔদার্য বাড়ল আর এই সমস্ত কিছুই বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হল। Saurat লিখেছেনঃ



"Literature partly mirrored and partly submitted to those various influences and events.

The dichotomy within the soul of the nation was mirrored spiritually in the opposition, in fact, between the movement represented by Mallarme and the movement represented by Zola. Symbolism and naturalism in literature were essentially related as opposites, as clericalism and republicanism."

আবার এ কথাও ঠিক যে সাহিত্যের ইতিহাস রাষ্ট্রিক ইতিহাস নয়। সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের সম্বন্ধ কেমনটি হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ

"এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাগের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয় বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে- কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয় এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখ দুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন হতে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই এক সঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রের নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে .....। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত।"

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল কথাটি এক অল্প কথায় এত সুন্দরভাবে আর কেউ বলেছেন বলে জানি না। সর্বাংগে না হলেও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে এই কথাটি অনেকাংশেই খাটে। ইতিহাসের প্রবহমান স্রোতের পটভূমিকায় সাহিত্যের ধারাবিবরণী দেওয়াই সাহিত্যের ইতিহাসের প্রধান কর্তব্য।

সাধারণভাবে সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় আর একটি সমস্যা হল *terminus ad quem* নির্ধারণ করা। অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসকার কোথায় থামবেন। ইতিহাসের সঙ্গে জার্নালিজমের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ইতিহাসের দৃষ্টিতে খুব কাছের জিনিস ধরা

পড়ে না। আর জার্নালিজমের কারবার কাছের জিনিসকে নিয়ে। এ কথাটা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধেও পুরোপুরি খাটে। খুব সমসাময়িক লেখকের নিরপেক্ষ বিচার করা সহজসাধ্য নয়। পরিচয় বা অপরিচয় সঠিক মূল্যায়নের পক্ষে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়াও আরো একটি বড় প্রশ্ন থাকে। তা হল পরিপ্রেক্ষিত বা perspective সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাপিত না হলে সাহিত্যের যথার্থ বিচার করা শক্ত, প্রায় অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে A.C. Ward তাঁর *Twentieth Century Literature* এর সপ্তম সংস্করণের (১৯৪০) ভূমিকায় যা বলেছেন তা বিশেষ প্রনিধানযোগ্যঃ

> While renewing my acquaintance with this book during the preparation of the present enlarged edition, it became evident to me that in 1940 I have fewer enthusiasms and fewer animosities than I had in 1928. I was, therefore, inclined, while making revisions and additions, to bring the following pages in the line with my current way of thinking. In a few instances this led to a substantial modification of opinions expressed in the earlier editions, but where my former interest in any particular writer has gone beyond recovery, I have allowed my departed soul to prevail. It is probable that if this survey had been first written at the present date I should have omitted entirely some names that seemed worth including in 1928.

A.C. Ward -এর এই স্বীকারোক্তি মেনে নিলে, বিশেষ করে ভূমিকার শেষ লাইনটি এবং এটিকে না মানার পক্ষে কোনো সঙ্গত কারণ নেই, একথাও মানতে হয় যে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণের জন্যে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকা দরকার। নৈকট্য নৈর্ব্যক্তিক বিচারের প্রবল প্রতিবন্ধক।

এতক্ষণ যা বলেছি তার থেকে দুটো সূত্র বের করতে পেরেছি। সূত্র দুটি হল, এক, সাহিত্যের ইতিহাস রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হওয়া উচিত। কেননা তার থেকে সাহিত্যে হাওয়া বা পালাবদলের হদিশ পাওয়া যায়। আর দুই, সাহিত্য বিচার ও বিশ্লেষণ যতদূর সম্ভব পক্ষপাতহীন করার জন্যে বর্তমান সময়ের বেশ কিছু আগেই আলোচনায় দাঁড়িটানা উচিত। সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের terminus ante quam* ঠিক করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।



।।২।।

প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় কিছু কিছু সমস্যা থাকে বা থাকতে পারে। সেই সমস্যাগুলি পূর্বে আলোচিত সমস্যাগুলির মতো সর্বজনীন বা সামান্য সমস্যা নয়। স্বতন্ত্র বা বিশেষ সমস্যা। একটা উদাহরণ দিলে হয়ত ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। ভাষা নিয়ে দেশ। আর ভাষা নিয়েই সাহিত্য। ইংরেজী ভাষায় ইংল্যান্ডে লিখিত সাহিত্যেই ইংরেজি সাহিত্য। কথাটা খুবই সরল। এখন ইংরেজী ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে সচরাচর যে অংশকে প্রাচীন ইংরেজী বা ইংরেজী সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয় Legouis ও Cazamian তাঁদের সাহিত্যের ইতিহাসে সেই যুগকে এ্যাংলো স্যাক্সন যুগ (Anglo-Saxon Period) বলেছেন। প্রাচীন যুগ বলেননি। এই না বলার পিছনে তাঁদের যুক্তি আছে। এবং সেটিকে হেলায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আপত্তি আপাতঃ দৃষ্টিতে ভাষাতাত্ত্বিক। Legouis ও Cazamian -এর বক্তব্য Beowulf বা the Battle of Maldon -এর ভাষা পরবর্তী কালের ইংরেজী ভাষা থেকে ধ্বনিতত্ত্বে, রূপতত্ত্বে, পদবিধিতে ও শব্দাবলীতে এতই স্বতন্ত্র যে এই ভাষাকে আমাদের জানা ইংরেজির প্রাচীনতর রূপ বলে স্বীকার করতে অসুবিধে হয়। কথাটা সত্যি বটে। আধুনিক ইংরেজির জ্ঞান নিয়ে কেউ প্রাচীন ইংরেজী পড়তে গেলে পদে পদে হোঁচট খাবেন। এটি যেন একটি স্বতন্ত্র ভাষা। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে একটি সমস্যা হচ্ছে কোথা থেকে শুরু করব- *terminus a qua.*

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অবশ্য এই ধরনের কোনো অসুবিধে নেই। চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে এখনকার বাংলার যথেষ্ট মিল আছে। আর অমিল যেটুকু আছে সেটুকু কালের ব্যবধানের জন্যে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে সমস্যা অন্য ধরনের। প্রথম সমস্যা হল উপাদানগত সমস্যা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপাদান হস্তলিখিত পুঁথি। আমাদের দেশের আবহাওয়ার দরুণ এবং এইগুলির মূল্য বা গুরুত্ব না বোঝার জন্যে অনেক পুথিই কালগত হয়েছে। দ্বিতীয়, পুথি প্রকাশনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যতটা বিজ্ঞানসম্মত রীতি প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল তা মোটেই হয়নি। পাঠ নির্ণয়ের ব্যাপারেও সাবধানতা খুব বেশি অবলম্বন করা হয়নি। সম্পাদক বুঝতে না পারলে পাঠ বদলে দিয়েছেন। ফলে 'শ্রী মতিলাল মুনি' হয়েছে 'শ্রীমতি লালমুনি' আর 'গলে দোলে বন্যমালা' হয়েছে 'গলে দোলে বর্ণমালা'। সুতরাং একজন David Daiches -এর যে সুবিধে আছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারের সেই সুবিধা নেই। অর্থাৎ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সহজপ্রাপ্য যথাসম্ভব

নির্ভুল প্রামাণ্য text অনেক ক্ষেত্রেই নেই। কিন্তু এটা একটা গুরুতর সমস্যা হলেও সাহিত্যের ইতিহাস লেখার পক্ষে অনতিক্রম্য বাধা নয়।

বাংলাদেশ ভারতবর্ষের প্রান্তস্থিত। ভারতের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব বাংলাদেশে অনেকদিন পড়েনি। খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই প্রভাব প্রথম দেখা গেল। তার ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক অবস্থায় ও সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হল। তার ফলে এক সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর ওপর অন্য একটি সংস্কৃতির প্রভাব পড়ল। এই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব পরে সমন্বয়ের রূপ পায়। এই সমন্বয়ের তাৎপর্য খুব গভীর। কেননা এর মধ্যে দিয়ে বাঙালীর সংস্কৃতি রূপ পেয়েছে। অধিকন্তু এই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব দুটি বিরুদ্ধ শক্তির, বিজয়ী এবং বিজিতের মধ্যে, নয়। দুটি ভিন্ন ধর্মের, দুটি ভিন্ন জীবন দর্শনের দ্বন্দ্ব। বাংলা সাহিত্যের এই অবস্থার সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে Norman Conquest -এর প্রভাবের কথা মনে আসতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর Norman Conquest -এর প্রভাব এর তুলনায় অনেক সরল। তবে Norman Conquest-এর পরে ফরাসী কথাবস্তু ইংরেজি সাহিত্যে যত দ্রুত অনুপ্রবেশ করেছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মুসলমানী' কথাবস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটতে কিন্তু অনেক দেরী হয়েছে। এবং তাও ঘটেছে উত্তর ভারতের মাধ্যমে। অবশ্য এ কথাটা প্রাপ্ত উপাদানের ওপর নির্ভর করে বলছি। হয়ত আগেই ঘটেছিল কিন্তু তা কালগত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমান রাজশক্তি প্রচলিত সাহিত্যের ধারাকে পোষকতা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী দুটি বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর মিলনকে সম্ভব করেছিল। এ বিষয়ে *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে* সুকুমার সেন যা লিখেছেন তা উদ্ধার করিঃ

> "এই অবস্থায় বিদেশীর শাসন দেশখণ্ডগুলিকে ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া চলিয়াছে। এই অধিকার প্রসার উপদ্রবহীন ছিল না বটে কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিতে খুব একটা আঘাত পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সাহিত্যচর্চা তো দূরের কথা উচ্চশিক্ষার ও জ্ঞানচর্চার সুযোগই থাকিবার কথা নয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে শমসুদ্দীন ইলিয়াস্-শাহ বাঙ্গালায় স্বাধীন সুলতান- রাজ্য সংস্থাপিত করিলে পর দেশ অনেকটা সুসংস্থিত হইয়াছিল। এই ইলিয়াস-শাহী বংশের রাজত্বকাল হইতেই এদেশে জ্ঞানচর্চার ও সাহিত্য অনুশীলনের পুনরারম্ভ। এই অনুশীলনের সুস্পষ্ট ফল পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে লক্ষ্য করা যায় না।"
>
> (*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮০-৮১, আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯১)

এই মিলনের পথকে সুগম করেছিল পরাগল খানের মতো ব্যক্তিত্ব এবং সম্ভাবিত করেছিল যবন হরিদাসের মতো ব্যক্তি।



মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব আবার দেখা দিয়েছিল ইংরেজ অধিকারের পরে। কিন্তু ইংরেজ-বাহিত সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির মিলন সঙ্গত কারণেই সার্বিক হতে পারেনি। এই সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছিল সমাজের শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও কিছু উচ্চ–মধ্যবিত্তের মধ্যে। এবং এই সাংস্কৃতিক ঘাত–প্রতিঘাতের ফল সাহিত্যে, বিশেষ করে প্রহসনধর্মী রচনায় যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে উচ্চকোটির সাহিত্যে। ইংরেজি সাহিত্যের অভিঘাতে মধ্যযুগের 'খোড় বড়ি খাড়া' আর 'খাড়া বড়ি খোড়ে'র বাংলা সাহিত্যের সামনে উদার দিগন্ত খুলে গেল। কিন্তু ইংরেজরা বিদেশীই থেকে গেল। এর অবশ্য কারণ বোঝা শক্ত নয়।

ক্ষমতার লোভ এবং ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের যে মিলনকে প্রতিহত করেছিল সেই মিলনকে সম্ভব করেছিল সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যকে তাই অখণ্ড কালপ্রবাহ হিসেবে দেখাটাই সঙ্গত। অন্য কোনো ধরনের যুগ বিভাগ যেমন অসঙ্গত তেমনি অবৈজ্ঞানিক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে বড় বাধা ছিল এই অখণ্ড কাল চেতনাবোধ। সুকুমার সেনের *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে* আমরা পাই প্রথম নৈর্ব্যক্তিক, অখণ্ড কালচেতনা বোধ যা বাংলা সাহিত্যকে একটি অখণ্ড স্রোত হিসেবে পাঠকের সামনে হাজির করেছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হলেও সব সমস্যার সমাধান হয়নি। নতুন কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যাটা হল কোনো বিশেষ তত্ত্ব বা আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা। বিশেষ কোনো তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে অনেক সময়ে অনেক সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যেমন *Othello* সম্বন্ধে কেউ বলতেই পারেন যে Shakespeare apartheid- এ বিশ্বাস করতেন। অথবা Shakespeare ইহুদী-বিদ্বেষী ছিলেন। এই ধরনের উক্তিতে নতুনত্ব থাকতে পারে সত্যতা কতদূর আছে সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ থাকে। বিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা আদর্শ বা মতবাদ দিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর নাট্যকারকে বিশ্লেষণ করা এক ধরনের anachronism। কালাতিক্রম দোষ সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যেমন মননশীল রচনার ক্ষেত্রেও তেমনি সমানভাবে পরিত্যাজ্য।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আরো অনেক সমস্যা হয়ত আছে যা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সেগুলির আলোচনা যোগ্যতর ব্যক্তির ওপর বরাত দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

# ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস

প্রীতি কুমার মিত্র

## ১.০. প্রথম কথা

১.১. ইতিহাসের অনেক, বলতে গেলে অসংখ্য, সংজ্ঞা আছে। সেসব বহুলতায় না গিয়েও বলা যায়, ভূতকালে মানব সভ্যতার সামগ্রিক আলোচনাই ইতিহাস। অতীতে ইতিহাস ছিল শুধু ধর্মাধিষ্ঠান অথবা রাষ্ট্রশক্তির ইতিবৃত্ত। আধুনিক যুগে ইতিহাসের পরিধি বাড়তে বাড়তে এখন history records "every manifestation of the human spirit." (ইতিহাস মানুষী চেতনার প্রত্যেক বহিঃপ্রকাশকে নিবদ্ধীভূত করে)।[১] তাই মানুষের বাসনা, আকাংক্ষা, কল্পনা, সৃজনোল্লাস ও রুচির অভিব্যক্তিস্থল সাহিত্যও ইতিহাসের একটি মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কারণ, সাহিত্য থেকে ঐতিহাসিক শুধু ভাষা ও শৈলীই পান না, বরং মানবের আত্মিক শক্তির সুক্ষ্মতম ও গভীরতম উপলব্ধিও সেখান থেকে আহরণ করেন।[২] বস্তুত অখন্ড হলেও ইতিহাসকে খন্ডিত করা হয় আলোচনার সুবিধার্থে। সাহিত্যের ইতিহাস সার্বিক ইতিবৃত্তের তেমনি একটি প্রত্যঙ্গ। আসলে এটি সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের একটি দিক।

## ২.০. সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস

২.১ শিল্পকলা যেমন সংস্কৃতির অংগ, সাহিত্যও শিল্প হিসেবে একটি সাংস্কৃতিক সামগ্রী। তাই সংস্কৃতির ইতিহাসে সাহিত্যের কথা আসে, সাহিত্য সৃষ্টি ও তার ব্যবহারের কথা থাকে। বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে এর কাজ হচ্ছেঃ

> "understanding of those ideas, thoughts, arguments, beliefs, assumptions, attitudes, and preoccupations that together made up the intellectual or reflective life of previous societies" (যেসব ধ্যানধারণা, চিন্তা, যুক্তিতর্ক, বিশ্বাস, অনুমান, মনোভংগি ও মানসিক ব্যস্ততা একত্রে অতীত সমাজসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক বা চিন্তা-জীবন গঠন করেছিল সেগুলি বিদিত হওয়া)।[৩]



এই সব মানসিক বিষয়গুলো বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলার মত সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়, হয়তো বা একটু বেশি পরিমাণেই হয়।[৪] তাই বিজ্ঞান, দর্শন, ও শিল্পকলার মত সাহিত্যও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। আবার বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস গণ-মানুষের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, মিথ্, কল্পকথা, সংস্কার, প্রতীক ইত্যাদি নিয়েও কাজ করে। এসব উপাদানের প্রতিফলন থাকে দেশের শিল্পকলায়, লোকসাহিত্যে, এমনকি নাগরিক সাহিত্যেও। তাই এখানেও সাহিত্যের ইতিহাস বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের একটি দিক আলোকিত করে।

২.২ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের উত্থানের সময় সাহিত্যও তার আওতাভুক্ত হয়, যদিও সাহিত্যের আলাদা ইতিহাস অনেক আগে থেকেই লেখা হচ্ছিল। অ্যামেরিকান ঐতিহাসিক আর্থার লাভজয় (১৮৭৩-১৯৬২) এর লেখা *দ্য গেট চেইন অব বিইং* (অস্তিত্বের মহাপ্রবাহ) (১৯৩৬) বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের এক বিখ্যাত গ্রন্থ। এই বইসহ লাভজয়ের অন্যান্য রচনা বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের মধ্যেকার কঠিন প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে সাহিত্যের ইতিহাসের উপর বিরাট প্রভাব রেখেছিল।[৫] লাভজয়ের স্বদেশী ও সমসাময়িক পেরি মিলার (১৯০৫-৬৩) ছিলেন সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক, ও সাহিত্যের অধ্যাপক। কিন্তু তিনিই আবার অ্যামেরিকার মানসিক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ট লেখকদের একজন। সাহিত্য থেকে কিভাবে চিন্তাধারার ইতিহাস সংগৃহীত হতে পারে সে সম্পর্কে জনৈক আধুনিক লেখক বলেনঃ

> "When the ... writings of whole generations of authors are examined, patterns of thought can emerge which establish the ideological assumptions of theeir age (গোটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লেখকদের রচনাসমূহ পরীক্ষা করলে চিন্তাধারার বিশেষ বিশেষ প্যাটার্ন বেরিয়ে আসে, যা থেকে ওই যুগের মতাদর্শগত অনুমানসমূহ ধরতে পারা যায়)।[৬]

এই কারণেই বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের আধুনিকতম প্রবণতাগুলোর একটি হচ্ছে সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহের পুরো পরিচয় নেয়ার জন্য এক যৌথ সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ও কাব্যিক অনুসন্ধান।[৭]

## ৩.০ অবরুদ্ধঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

৩.১. অতএব সাহিত্যের ইতিহাস কোনো নিশ্ছিদ্র প্রাচীরবেষ্টিত অংগন নয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেন সেই রকমই। অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাস সাধারণ ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয় বলে প্রতিভাত। বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লেখেন তাঁরা সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক নন। দেশের ইতিহাসবেত্তাদের মহলে তাঁদের ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃতি নেই। আবার পেশাদার ঐতিহাসিকেরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং কিয়ৎ পরিমাণে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চর্চা করলেও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশারদ হন না বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাধারণ ইতিহাসের কারিকুলামে সাহিত্যের ইতিহাসের স্থান দৃশ্যত নেই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের গবেষণা, প্রণয়ন, পঠন, ও পাঠন একমাত্র বাংলা বিভাগেই হয়ে থাকে এবং যাঁরা এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাঁরা কেউ সাধারণ ইতিহাসের ব্যাপারী নন। এভাবেই এদেশে ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে প্রায় 'ভাসুর-ভাদ্দরবৌ' সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে।

### ৪.০. অলিখিতঃ বুদ্ধির ইতিহাস

৪.১ আসলে এদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের চর্চাই নগণ্য। গোটা উপমহাদেশের ক্ষেত্রেই এ মন্তব্য করা চলে। সাহিত্যের ইতিহাস, দর্শনের ইতিহাস এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিজ্ঞানের ইতিহাস সাধারণ ইতিহাসের বাইরে চর্চিত হয়ে খন্ডিতভাবে মানসিক ইতিহাসের সল্‌তে জ্বালিয়ে রেখেছে। দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক বিবর্তনের কোনো সুসংবদ্ধ বিবরণ প্রণীত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সার্বিক বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের অবর্তমানে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ইতিহাসও সংকীর্ণ গন্ডী অতিক্রম করে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারছে না। শিল্পকলার ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওই বিষয়ের এক আধুনিক প্রবক্তা বলেন, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস থেকে প্রজ্ঞা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেই শিল্পকলার ইতিহাসকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।[৮] এই পর্যবেক্ষণ সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কেও সর্বৈব প্রযোজ্য। কারণ সাহিত্যও সুকুমার শিল্প। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসই নেই এদেশের, তা কোথা থেকে ওই প্রজ্ঞা ও পদ্ধতির যোগান পাবে শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস? দক্ষিণ এশিয়া ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব প্রধান অঞ্চলের (পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা প্রমুখ) বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস এখন পুর্ণ প্রতিষ্ঠিত। দেরি হয়ে গেলেও আমাদের এ অঞ্চলের মনন ও সৃজনের ব্যাপক ও বহুমুখী ইতিহাস রচনার কাজ এখনই হাতে নেয়া জরুরী। তার আগে সাহিত্যের ইতিহাসের বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

### ৫.০. ব্যাপক প্রেক্ষিত

৫.১ সাহিত্যের সামাজিক প্রেক্ষিতের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম রচয়িতা কাজী দীন মুহম্মদ সাহিত্যে দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও মনোজীবনের প্রতিফলনের কথা বলেছেন।[৯] সাহিত্যের "রাজনৈতিক, সামাজিক ও



সাংস্কৃতিক পটভূমি"- ও তাঁর বিবেচনায় এসেছে।[১০] "সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিস্তৃত পটভূমিকায়" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[১১] সাহিত্যের অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক (শিষ্টজনের মনন এবং লৌকিক চিন্তা ও বিশ্বাসাদি উভয়ই) প্রেক্ষিতও অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। একথা বলা খুবই যৌক্তিক যে, দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক পরিস্থিতি সাহিত্যের মান, পরিমাণ, ও প্রকৃতির উপর প্রভাব রাখে। অপর পক্ষে সাহিত্যও দেশের সমাজ সংস্কৃতি, রাজনীতি, ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে থাকে। ঐতিসাহিক পরিবর্তন সমূহের সাধন ও বাহন হিসেবে সাহিত্যের ভূমিকা পরিবিদিত।

### ৬.০ প্রতিশ্রুতি বনাম কাজ

৬.১. অতএব দেশের ব্যাপক ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের ইতিহাস আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। সেজন্য সাধারণ ইতিহাস থেকে আলাদা করে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার অবকাশ নেই। অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ওই অঘটনই ঘটছে। "দেশের ইতিহাসের যথার্থ ধারণার অভাব" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক লেখকের একটি প্রধান দুর্বলতা-একথা স্বয়ং সুকুমার সেনই বলেছেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থের ভূমিকায়।[১২] এই সচেতনতা নিয়ে অধ্যাপক সেন এবং আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাংলা সাহিত্যের অপর দুজন প্রখ্যাত ইতিহাস-প্রণেতা চেষ্টা করেছেন বাংলার ব্যাপক ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত করে সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে।

৬.২ রবীন্দ্রনাথের মতে সুকুমার সেনের গ্রন্থ "সাহিত্যের ইতিহাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়ায় রচনার মূল্যবৃদ্ধি" হয়েছে।[১৩] সন্দেহ নেই। তবু বলতেই হয়, অধ্যাপক সেনের গ্রন্থে (১৯৪০) বিভিন্ন যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, রাজনৈতিক ইতিহাস তত পরিস্ফুট হয়নি। অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের দিকে তিনি মোটেই যাননি। তাছাড়া সব জায়গায় সাহিত্যের সাথে ঐতিহাসিক বাতাবরণের সম্পর্কটি বিশদ হয়নি। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে (১৯৫৯) ব্যাপক ইতিহাসের আলোচনা অপেক্ষাকৃত ভালো হয়েছে। বিশেষত তিনি বাঙালির মনোজীবনের সাথে তার সাহিত্যের সম্পর্ককে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন আন্তরিকতার সাথে। কিন্তু দেশের পূর্ণাংগ বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস রচিত না হওয়ায় তাঁর চেষ্টা যথোচিত ফলপ্রসূ হয়নি। তাছাড়া পৃথক অধ্যায়ে প্রদত্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা সমকালীন সাহিত্যের সাথে কিভাবে সংশ্লিষ্ট তা পরিস্কার হয়নি। কাজী দীন মুহম্মদ সাহেবের বই-এ (১৯৬৮) সমাজ ও সংস্কৃতির কথা খুব সংক্ষেপে

এসেছে এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের পৃথক রূপরেখা দেয়া হয়েছে। এসবের সাথে বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র মোটেই স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি। মানসিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রসংগ এ বই-এ একেবারেই আসেনি। আরো আধুনিক কালে (১৯৭৬) রচিত দুসান জ্বাভিতেল্-এর *বেঙ্গলি লিট্রেচার* (বাংলা সাহিত্য)-এ সাহিত্যের উত্থান-পতন ও বিবর্তনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে।[১৪] কিন্তু সংক্ষিপ্ত এই বই-এ ভূমিকা ছাড়া অন্যত্র বিষয়টির উল্লেখ নিতান্তই স্বল্প। ভূমিকার আলোচনাও সংক্ষিপ্ত এবং কয়েকটি বিশেষ বিন্দুতে সন্নিবদ্ধ।

### ৭.০. উনিশ-বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য

৭.১. প্রাচীন, মধ্য, ও আধুনিক পর্বের বাংলা সাহিত্যের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য এবং যুগসন্ধিকালীন বন্ধ্যাত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জ্বাভিতেল্ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ওলট-পালটকে দায়ী করেছেন।[১৫] কিন্তু মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্যেও একাধিক উপপর্ব আছে যেগুলির বিভিন্নতার সাথে রাষ্ট্রিক, আর্থিক, ও বৌদ্ধিক ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। উনিশ ও বিশ শতকে রচিত বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায় তার একটি কারণ হলো ওই দুই শতকে বাঙালির সাধারণ ইতিহাসের বিভিন্নতা। সংস্কার-মনস্কতা ও নবাগত ইউরোপীয় দর্শনের প্রভাব থেকে লিখে গেছেন উনিশ শতকের সাহিত্যকাররা। তাই ওই সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে হলে প্রধানত সমসাময়িক বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই তা করতে হবে। মধুসূদন ও বঙ্কিমের তাৎপর্য নির্ণয় ও স্থান নিরূপণের এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। পক্ষান্তরে বিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে রাজনীতির প্রতাপ দোর্দন্ড। স্বদেশী আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, বাম আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রভৃতি বিশাল বিশাল রাজনৈতিক ঘটনার প্রেরণায় রচিত হয়েছে এ শতকের বাংলা সাহিত্যের সিংহভাগ। সাহিত্যের দিকপালেরা আন্দোলিত হয়েছেন সমকালীন রাজনীতির উত্তেজনায়। আবার রচিত সাহিত্যও প্রভাবিত করেছে রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে। তাই বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতাকে হতে হবে শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশারদ। সমকালীন রাজনীতির সম্যক বোধ ছাড়া নজরুল, সুকান্ত ও শামসুর রাহমানকে বোঝা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের সঠিক অবস্থান দেখানোর কথা ভাবাই যায় না। তবে এও সত্যি যে বিশ শতক এক যথার্থ জটিল সময়। তাই এর ইতিহাসের নানা মাত্রার সাথে ওয়াকিবহাল থেকেই কেবল সার্থক সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন সম্ভব।



### ৮.০. ইতিহাস, সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস

৮.১ ইতিহাস ও সাহিত্যের নিবিড় সম্বন্ধ সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। ইতিহাস রস-সাহিত্য না হলেও ক্ষেত্রবিশেষে উত্তম ঐতিহাসিক রচনা সাহিত্য পদবাচ্য। যেমন, এডওআর্ড গিবনের *ডেক্‌ল্যাইন আন্ড ফল অব দ্য রেমান এম্‌পায়ার* (রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন), কিংবা ইওহান হুইজিংগার *দ্য ওএনিং অব দ্য মিডল এজেস* (ক্ষীয়মান মধ্যযুগ)। ইতিহাস মানববচর্চা করতে বাধ্য বলে সাহিত্যের সাথে তার অপরিহার্য নৈকট্য। আবার ইতিহাস জনগোষ্ঠির ভূমিকা বিবেচনা করে বলে সে সমাজবিজ্ঞানের নিকটবর্তী। কিন্তু কোনোটির সাথেই একীভূত নয়। ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তি-আশ্রয়ী বলে বিজ্ঞানধর্মী। কিন্তু সংবেদনশীল ও সৃজনক্ষম মানবজাতির কীর্তিকথার কথক ও বিশ্লেষক হিসেবে ইতিহাস গাণিতিক বিজ্ঞান বা এক্‌জাক্‌ট্ সায়েন্স হতে পারে না। ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রায়শ খন্ডিত ও অযথেষ্ট বলে ইতিহাস রচনায় সীমিত কল্পনা ও সমানুভূতি (empathy) ব্যবহার্য, কিন্তু সাহিত্যিকের স্রষ্টাসুলভ বিস্তীর্ণ কল্পনার স্থান সেখানে নেই। রসসৃষ্টির অবকাশও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ঐতিহাসিক দ্রষ্টা, সাহিত্যিক স্রষ্টা।[১৬]

৮.২. এদিকে সাহিত্যের ইতিহাসও কিন্তু অবশ্যই ইতিহাস, রসসাহিত্য নয়। ইতিহাসের মতই তাতে থাকতে হবে তথ্যনিষ্ঠা, যুক্তিদার্ঢ্য, এবং ঘটনাবলীর ব্যাপক সম্পর্কজাল প্রদর্শন প্রচেষ্টা। আবেগ, সংবেদনা, ভাবালুতা, অবাধ কল্পনা, এবং সৃজনোল্লাসের স্থান সেখানে থাকবে না। কারণ এগুলো সাব্‌জেক্‌টিভিটি বা আত্মনিষ্ঠতার উপাদান। ইতিহাস দাবি করে অব্‌জেক্‌টিভিটি বা বস্তুনিষ্ঠতা। সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতাও অবশ্যই ঐতিহাসিক। তাই তাঁকে ওই দাবি মেটাতে হবে। বিষয়বস্তু থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে রেখে নিরাসক্ত, নিরাবেগ ভঙ্গিতে তাঁকে লিখে যেতে হবে সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস। এজন্য তাঁর থাকতে হবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ–ইতিহাসে, ঐতিহাসিক পদ্ধটিতে, এবং ইতিহাসতত্ত্বে। সাধারণভাবে বিস্তারিত ইতিহাসে জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যের ইতিহাসের মত বিশেষ ইতিহাস লেখার অধিকার জন্মায় না। কারণ ওই প্রস্তুতি না নিয়ে লিখলে সে লেখা একদেশদর্শী তথা ইতিহাসের বিস্তীর্ণ ভুবনের সাথে সম্পর্কশূন্য হতে বাধ্য। গবেষণার 'হিস্টরিক্যাল-ক্রিটিক্যাল মেথড' জানা না থাকলে ইতিহাস সংক্রান্ত কোনো গবেষণাই করা যায়না, সাহিত্যের ইতিহাসেও না। করলে তাতে বিপরীত ফল লাভ হয়ে থাকে। আর হিস্টরিঅগ্রাফি বা ইতিহাস রচনা প্রণালীতে দক্ষ না হলে রচনা ইতিবৃত্তগুণে সমৃদ্ধ না হয়ে সাহিত্যগুণান্বিত বা অন্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে পড়ে

এবং লক্ষ্যচ্যুত হয়। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে এসব ত্রুটি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। অতএব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের প্রস্তুতি নিতে হবে ছাত্রজীবন থেকেই। বাংলা সাহিত্য পাঠের সাথে সাথে বাংলা অঞ্চল তথা উপমহাদেশের ইতিহাসে পাঠ নিতে হবে। উপমহাদেশের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে এশিয়া ও ইউরোপের ইতিহাসেও সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আরো নিতে হবে ইতিহাসতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সবক। এসব পাঠ ইতিহাস বিভাগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের কাছ থেকে নেয়াই অধিকতর কার্যকর। বাংলা সাহিত্যে বিস্তারিত জ্ঞানের অতিরিক্ত এই প্রস্তুতি যাঁর থাকবে তাঁরই সম্ভাবনা থাকবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সার্থক প্রণেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার।

৮.৩. অনুরূপভাবে এও বলতে হবে যে, সাহিত্যের ইতিহাস বাদ দিয়ে দেশের ইতিহাসের কথা কল্পনা করা যায় না। সাহিত্যসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কলায় ব্যবহৃত প্রতীক সমূহের মধ্য দিয়েই একটা জাতির আত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং তার ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনেক খবর অবগত হওয়া যায়। ইতিহাসকে মানবচর্চায় নিরত রাখার স্বার্থে এবং নির্বিকার সমাজবিজ্ঞানে পর্যবসিত হওয়ার বিপদ থেকে তাকে বাঁচানোর তাগিদে ঐতিহাসিককে সাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ট থাকতেই হবে। ইতিহাস যখন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিভাগে (যেমন অর্থনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস ইত্যাদি) ভাগ হয়ে যাচ্ছিল, তখন সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের "আনাল স্কুল" ১৯৩০-এর দশকে "promoted a view of history resting on the close collaboration of all the *human* and social sciences" (সকল *মানবিক* ও সামাজিক বিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের ধারণা চালু ও পুষ্ট করেন।)[১৭] এই 'সহযোগিতা'র বিশেষ ক্ষেত্র ছিল "methods and findings." অর্থাৎ ইতিহাসে ওই সব ডিসিপ্লিনে অনুসৃত বিবিধ পদ্ধতির সম্ভাব্য ব্যবহার এবং তাদের আহৃত ফলাফলের যথাযথ বিবেচনা। বলা বাহুল্য, এখানে "মানবিক বিজ্ঞান" বলতে যেসব বিষয়ের প্রতি ইংগিত হয়েছে তার মধ্যে মুখ্য হচ্ছে সাহিত্য।

৮.৪. অতএব এদেশে ইতিহাসের পঠন-পাঠন-গবেষণায় যাঁরা নিযুক্ত সেই ঐতিহাসিককুল শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের ত্রিপার্শ্বিক গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাঁদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রীয় ইতিহাসকে দেশের বাকি



ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে নিয়ে সামগ্রিক ইতিহাস নির্মাণে ব্রতী হতে হবে। তখনই ইতিহাসে চিন্তাচেতনা, ঘটনাবলী ও শিল্পকলার পরস্পর সংশ্লিষ্টতা বিশদ হয়ে সত্যিকার অখন্ড ইতিহাসের সাক্ষাৎ মিলবে। এ কাজের জন্য ঐতিহাসিকদের থাকতে হবে উপযুক্ত প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ। ইতিহাসে বিস্তৃত পাঠ গ্রহণের সাথে সাথে উদ্দিষ্ট বিষয়ে, ধরা যাক বাংলা সাহিত্যে, বিষয়গত ও পদ্ধতিগত জ্ঞান অর্জন করতে হবে, সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনে কোর্স নেয়ার মাধ্যমে। এভাবে প্রস্তুতি নেয়া ঐতিহাসিক বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের ওই শাখায়, বর্তমান আলোচনায় সাহিত্যের ইতিহাসে, দক্ষতা লাভ করে ওই এরিয়ায় গবেষণামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। যথেষ্ট পরিপক্কতা অর্জনের পর সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় হাত দিলে চমৎকার ফল আশা করা যায়। এভাবে সাহিত্যে সবকপ্রাপ্ত পেশাদার ঐতিহাসিকের লেখা সাহিত্যের ইতিহাস উপরে উল্লিখিত ইতিহাস বিদ্যায়, প্রশিক্ষিত সাহিত্যসুধীর রচিত ইতিহাসের সমমানের কাজ হবে।

৮.৫. অবশ্য এই দুই ধরণের রচনায় পার্থক্য থাকবে না তা নয়। থাকবে, তবে তা কখনই বিরুদ্ধধর্মী না হয়ে বরং পরস্পর সম্পুরক হবে। ইতিহাসবেত্তার রচনায় সাহিত্যের বৃহত্তর আঙ্গিক (সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র-অর্থব্যবস্থা-বুদ্ধিবৃত্তি) অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে সামগ্রিক ইতিবৃত্ত-প্রবাহে সাহিত্যের একাঙ্গতা বিশদ করবে। অপর পক্ষে ইতিহাসে প্রশিক্ষিত সাহিত্যের পন্ডিতের রচিত গ্রন্থে বৃহত্তর আঙ্গিকের সাথে সাথে সাহিত্যের নিজস্ব দিকগুলি, বিশেষত তার শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অধিক বিকশিত হবে। এভাবেই ওই দুই রচনা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবে। উপরন্তু, প্রথমোক্ত ঐতিহাসিক সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া যখন সাধারণ ইতিহাস লিখবেন তখন তাতে সাহিত্যের ভূমিকা সুচারুরূপে উপস্থাপিত হবে, সন্দেহ নেই।

## ৯.০. উপসংহার

৯.১. মেথডলজি, অবজেক্টিভিটি, ইতিহাসের সামগ্রিকতা, সমাজ ও সভ্যতার বাকি সবকিছুর সাথে সাহিত্যের সত্যিকার সম্পর্ক-এ কটি দরকারি জিনিষের স্বার্থে ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের তথা সাহিত্যের ইতিহাসের অ্যাকাডেমিক ঘনিষ্ঠতা ও লেনদেন অত্যন্ত জরুরি। এদেশে এতদিনেও এই যৌথতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তার অপুষ্টি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পক্ষান্তরে সাধারণ ইতিহাসও দরিদ্র রয়ে গেছে, বিশেষত বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের উত্থানই হয়নি। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের চর্চা ও গবেষণা সাহিত্য এবং সুকুমার শিল্পের মূল্যায়ন ও ইতিবৃত্ত রচনার জন্য অপরিহার্য। সাহিত্যের ইতিহাসের বহুমান্য লেখকদের অনেকেই তাঁদের কাজ ব্যাপক

ইতিহাসের নিরিখে সম্পাদন করার দায়িত্ব অনুভব করেছেন এবং সেদিকে কিছুটা এগোতে চেষ্টা করেছেন। তারা আশানুরূপ সফল হননি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে, সাহিত্য বিষয়ে সাধারণ ইতিহাসবিদ্‌দের ঔদাসীন্যের কারণে, এবং সমুন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের অবিদ্যমানতার জন্য। অতএব এখন কর্তব্য এসব বাধা অপসারণের কাজ হাতে নেয়া এবং সাহিত্যের ইতিহাসকে নতুনভাবে দেখা ও লেখা।

৯.২. স্বনামধন্য এমিল লেগুই ও লুই কাজামিঅঁ তাঁদের স্বদেশ ফ্রান্সে তাঁদের লেখা *ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থখানি কেমন সাড়া জাগিয়েছিল সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> Its appeal was... to all those Frenchmen who have a curiosity regarding England and things English, who desire... to grasp the dominating features of succeedig periods and follow the reflection in books of the development of a great people. [ইংল্যান্ড ও তথা ইংরেজদের নানা বিষয়ে যেসব ফরাসীর কৌতূহল আছে, যাঁরা পর পর চলে আসা বিভিন্ন যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বুঝতে চান, এবং এক মহান্ জাতির ক্রমোন্নতির যে প্রতিফলন (সাহিত্যিক) রচনাবলীতে ঘটেছে তা অনুধাবন করতে চান, তাঁদের সকলের কাছে এ বই আবেদন রাখতে পেরেছে]।[১৮]

হ্যাঁ, এই-ই প্রকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, যা পড়লে একটা দেশ ও তার অধিবাসীদের বাইরের ও অন্তরের যুগযুগান্তব্যাপী পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন তা বাংলা ও বাঙালির অর্ন্তজীবন ও বর্হিজীবনের বিস্তারিত পরিচয় অবশ্যই বহন করবে।

## নির্দেশপুঞ্জি


১। ইমেরি নেফ্, *দ্য পোএট্রি অব হিস্ট্রি* (নিউইয়র্ক ও লন্ডনঃ কলাম্বিআ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৭), পৃ. ৩।

২। তদেব, পৃ. ৩-৪।

৩। স্টেফ্যান কলিনি, "হোঅট ইজ ইন্টেলেকচুআল হিস্ট্রি?", অন্তর্গত , জুলিএট গার্ডিনার (সম্পা), *হোঅট ইজ হিস্ট্রি টুডে* (লন্ডনঃ ম্যাকমিলান এডুকেশন, ১৯৮৮), পৃ. ১০৫।

৪। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের বিশ্রুত ফরাসী রচয়িতা এমিল লেগুই ও লুই কাজামিঅঁ তাদের ওই বিরাট কাজকে বর্ণনা করেছেন "to penetrate the mysteries of an intellectual nationality" (এক বুদ্ধিবৃত্তিক জাতির রহস্যসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ





করা) বলে। লেগুই ও কাজামিঅঁ, *অ্যা হিস্ট্রি অব ইংলিশ লিট্‌রেচার*, অনু. হেলেন ডগ্‌লাস আরডীন, (লন্ডন ঃ জে. এম. ডেন্ট অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৯৭১), পৃ. (১৪)।

৫। জন ক্যানন ও অন্যান্য (সম্পা.) , *দ্য ব্ল্যাকওএল ডিক্‌শনারি অব হিস্টরিআন্‌স্* (অকসফোর্ড ঃ ব্যাসিল ব্ল্যাকওএল লিঃ, ১৯৮৮), পৃ. ২৫৪।

৬। তদেব, পৃ. ২৪১ (ডব্লিউ. এ. স্পেক-এর লেখা "লিটরেচার অ্যান্ড হিস্ট্রি" নিবন্ধ)।

৭। হ্যারি রিটার, *ডিকশনারি অক কনসেপ্টস্ ইন হিস্ট্রি* (ওএস্ট পোর্ট, কানেকেটিকাটঃ গ্রীইউড প্রেস, ১৯৮৬), পৃ. ২৩৬।

৮। জন হাউস, "হোঅট ইজ দ্য হিস্ট্রি অব আর্ট?", অন্তর্গত, গার্ডিনার, হোঅট ইজ হিস্ট্রি টুডে, পৃ. ৯৯।

৯। কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮), ভূমিকা, পৃ. এক।

১০। তদেব, সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম, পৃ. ১৭০।

১১। অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম খন্ড, ২য় সং, (কলকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৭০), 'লেখকের নিবেদন' (১ম সং,) পৃ. (৮)।

১২। সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খ. পূর্বার্ধ, ৫ম সং, (কলকাতাঃ ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭০), পৃ.

১৩। তদেব, উপক্রমণিকার আগে সন্নিবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের চিঠি।

১৪। জ্যান গভা (সম্পা.), *অ্য, হিস্ট্রি অব ইন্ডিআন লিটরেচার*, খ. ৯, পর্ব ৩, বেঙ্গলি *লিট্‌রেচার*, দুসান জ্বাভিতেল প্রণীত, (ভাইসবাডেন ঃ অটো হারাসোভিট্‌স্, ১৯৭৬), ১২০।

১৫। তদেব, পৃ. ১১৯-১২৩।

১৬। অসীন দাশগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য* (কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯), পৃ. ১১-১৩, ১৫-১৬, ২৬-২৭, ৪০-৪১।

১৭। ডেভিড টমসন, "দ্য রাইটিং অব কন্‌টেম্‌পোরারি হিস্ট্রি", উদ্ধৃত, রিটার, ডিকশনারি, পৃ. ২৪১। বাঁকা অক্ষর বর্তমান লেখকের।

১৮। লেগুই ও কাজামিঅঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. (১৩)।

DONATED BY
DR. MAH UD SHAH
QURESHI & FAMILY

## প্রবন্ধকার পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| সৈয়দ আলী আহসান | ঃ | চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক, ২টিতে বিভাগ প্রধান, ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আই.বি.এস-এর পরিচালনা পরিষদের সাবেক সভাপতি, ইউ.জি.সি-চেয়ারম্যান (অবসরপ্রাপ্ত); সাহিত্যের ইতিহাসকার। |
| মনসুর মুসা | ঃ | ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যের ইতিহাসকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক, বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক। |
| মুস্তাফা নূরউল ইসলাম | ঃ | তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক, শিল্পকলা ও বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক, সাহিত্যের ইতিহাসকার। |
| মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল | ঃ | দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যের ইতিহাসকার। |
| মুহম্মদ আব্দুল খালেক | ঃ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক, সাবেক ডীন, উপ-উপাচার্য ও বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। লোকবিজ্ঞানী ও সাহিত্যের ইতিহাসকার। |
| মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান | ঃ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, কবি ও সাহিত্যের ইতিহাসকার। |
| মিন্নাত আলী | ঃ | মহাবিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ; কথাশিল্পী। |
| অনিমেষ কান্তি পাল | ঃ | ভাষাবিজ্ঞানী ও বাংলার অধ্যাপক, বর্তমানে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। |
| ভূদেব চৌধুরী | ঃ | বিশ্বভারতীর অবসরপ্রাপ্ত বাংলার অধ্যাপক ও সাহিত্যের ইতিহাসকার। |
| শ্রী সুভদ্র কুমার সেন | ঃ | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক। |
| প্রীতি কুমার মিত্র | ঃ | আই.বি.এস-এ আধুনিক বাংলার ইতিহাস ও ইতিহাস তত্ত্বের সহযোগী অধ্যাপক। |
| মাহ্‌মুদ শাহ্ কোরেশী | ঃ | আই.বি.এস-এ সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের অধ্যাপক ও পরিচালক। সর্বন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ভূতপূর্ব শিক্ষক। বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক। |